ধূপছায়া

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৬৪
তৃতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৬৪
চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
পঞ্চম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৬৫
ষষ্ঠ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৬৬
সপ্তম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

ব্লক
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

ব্লক মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ওরিয়েন্ট বাইন্ডিং ওয়ার্কস

চার টাকা

উৎসর্গ

অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের

করকমলে

এই লেখকের—

দেশে বিদেশে

চাচা কাহিনী

পঞ্চতন্ত্র

অবিশ্বাস্য

ময়ূরকণ্ঠী

জলে ডাঙায়

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে আমি নিরতিশয় সঙ্কোচ বোধ করছি। তার কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণ এই যে, ডঃ আলী সুপণ্ডিত লেখক; তাঁর বইয়ের ভূমিকা লিখতে হলে অন্তত যেটুকু যোগ্যতা না-থাকলেই নয়, তাও আমার নেই। আমি তাঁর একজন অনুরাগী পাঠকমাত্র।

এবং পাঠক হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, লেখক হিসেবে তিনি অত্যন্তই অল্পপ্রসূ। তিনি জনপ্রিয় লেখক। এত অল্প সময়ের মধ্যে আর-কোনও লেখক তাঁর মত এত নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন বলে আমি অন্তত জানি নে। বাঙালী পাঠকসমাজকে তিনি প্রায় দেখেছেন এবং জয় করেছেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, পাঠকসমাজকে যতই না কেন দোষ দেওয়া হোক, সব সময়েই তাঁদের বিচারে কিছু ভুল হয় না। ভাল বইকেও তাঁরা ভালবাসতে জানেন। ডঃ আলী তাঁদের ভালবাসা পেয়েছেন, সুখের কথা। দুঃখের কথা এই যে, অতঃপর তাঁর বইয়ের সংস্করণ-সংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বইয়ের সংখ্যা সে-হারে বৃদ্ধি পায় নি।

ইতিমধ্যে আমাদের মনে হয়েছে যে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর যে-সব লেখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং এখনও যা কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, অনায়াসেই তাদের কিছুটা একত্র করে তাঁর অনুরাগী পাঠকদের হাতে নতুন আর-একখানি বই উপহার দেওয়া চলে। এ-ব্যাপারে তাঁর সম্মতি পেতে আমাদের অশেষ শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। সান্ত্বনা এই যে অকারণে স্বীকার করতে হয় নি।

গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথাটি উল্লেখ করবার প্রয়োজন ছিল।

কলিকাতা,
১০ই পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক

সূচীপত্র

দেশভ্রমণ

—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—০—

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছি নে কেন—যে গোরু ইস্কুল আসতে-যেতে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই! সে-কথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিঙ আর একটা ন্যাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অসুখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মর্জি ভাল থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশী হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিঙ বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিঙ। চার পা বলাও অবান্তর নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পাও হতে পারত, কিন্তু একটা ন্যাজ বলার ত কোন মানে হয় না—আজ পর্যন্ত ত কোন জানোয়ারের দুটো ন্যাজের কথা শুনি নি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজী ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হ্যাজ এ টেল। 'এ'টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম 'এ টেল'টা গোরুর ন্যাজ নয়, ইংরেজী ব্যাকরণের ন্যাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, বাংলাতে যখন 'একটা' ব্যবহার না করে দিব্য বলতে

পারি 'গোরুর ন্যাজ আছে' তখন ইংরেজের মত সুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বাহ্ণে বৃক্ষাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন?

আমি ইংরেজী লিখতে পারি নে। যাঁরা ওই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই 'এ'র ন্যাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সে-কথা থাক্।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, 'দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর', তখন সে-বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক এ-কথা কখনই বলে ফেলব না, 'গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোল্লারমশাই গোরু চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।' কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে ত বুঝি দাদীর বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছইয়ের ভিতরের দিকটা—ছইয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারী গলায় বলতেন, 'থাক্ থাক্, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।' বাংলা ভাষাটা নিতান্ত পশ্চিম-বাংলার ভাষা। না হলে 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়' না বলে বলত, 'ডানপিটের মরণ বিলের তলায়'। সেই ছইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ত আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন 'এসে বুক' মুখস্থ করে বীরভূমের হেতমপুর ইস্কুলের বিশ্বম্ভর ভড় গেলবার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। 'চিত্তের প্রসার', 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য,' 'কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা' ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অসুবিধা হত না—ইস্কুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভিতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোন আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম, তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড়

মসজিদ তক্'—অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগ্নে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে 'দুর্গা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার 'দেশভ্রমণ' করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণব্রতে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়ত তাঁর গাত্রস্পর্শ করে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নি-পরীক্ষা তাঁকে তখন পেরোতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একনেবাদ্বিতীয়ম্ দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি তাঁর নর্মসখী কৃশাঙ্গী তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাহুঁকোর সুচিক্কণ কুক্ষিদেশে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেন নি। তিনি 'পথে নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে শুচিস্মিতাকে সজল নয়নে তার সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিখছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রী ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হক্ক ছিল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে 'পয়েণ্ট' দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানি নে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মত। ছেলে-ছোকরারা খাবে, তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিদ্যে হয় তবে তো গাড়সাহেব গোজমন আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরুষ। আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দিগ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু: আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, 'তবে কি বাঙ্কেনটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে?'

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কব্জা করে রেখেছেন। অর্থাৎ দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওযাব পরই মানুষ দেশভ্রমণে বেরয় না ; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্কর আছে, সে-ই বেরয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরয় পণ্ডিতমশায়ের মত গজবাতে গজরাতে, কেউ বেবয় চেন-ছাড়া পাপির মত তিড়িং তিড়িং কবে তিন লম্ফে গেট পেবিয়ে।

দেশভ্রমণ কবেছি, এ-বকম একটা খ্যাতি আমার আছে। এ-সম্বন্ধে কোন প্রকাবেব উচ্চবাচ্য আমি কবি নে। অর্থাৎ আমি যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোব সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভাল কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ-সম্বন্ধে কোন প্রকাবেব ইঙ্গিত দেবাব প্রয়োজন মনে কবি নে। অথচ, আমাব বহু সহৃদয় পাঠক ধবে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণেব নাম শুনলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে তদ্দণ্ডেই বন্দব পানে ধাওয়া কবি।

এ-ধাবণাটা সত্য নয়। কিন্তু তবু এটাব প্রতিবাদ আমি কবতুম না, যদি না এ-ধাবণা আমাব প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচাব কবত। কিংবা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপাব হত তা হলেও চুপ কবে থাকলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এ-ব্যাপাবে আমিই সবেধন উজ্জ্বল-নীলমণি নই, আমাব চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলাব সঙ্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে 'ফলনা দেশভ্রমণ কবতে ভালবাসে' তখন সে-বাক্যে আমি প্রশংসাব চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী। এ যেন অনেকটা 'ওঠ ছুঁড়ি তোব বিয়ে, গামছা পব গিয়ে'। তার অর্থ মেয়েটা এমনি মাবাত্মক রকমের হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ে কববার জন্য যে, বাপ-মাব স্নেহ-ভালবাসার তোযাক্কা সে আব করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোন ক্ষোভ নেই, বিয়ের অপরিহার্য

আনুষঙ্গিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাদ্যিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছা পরেই পড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাঁড় দেশভ্রমণকাবীব অর্থও তা-ই। যে-মাটিতে তাব নাড়ি পোতা আছে, যে-নদীব জল খেযে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঁঠাল তাকে ছাযা দিযে শ্যামল শীতল কবে বেখেছে, যাব প্রতিটি দূর্বাদল তাব পদ-তাডনা কামনা করে - তাবা যেন কিছুই নয়, তাবা যেন বানেব জলে ভেসে-আসা ফেলনা। গুরুদেব আশীর্বাদ, বাপ-মাযেব স্নেহ, ভাই-বোনেব ভালবাসা, বন্ধুজনেব সদাশয়িকতা, এসব কথা আব তুললুম না, সেগুলো এতই শুচিশুদ্ধ পবিত্র যে, ওদেব স্মবণকে কলঙ্কিত কবে মহাপাতকী হতে চাই নে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, 'কী জ্বালা, লোকটা ত আব চিবকালেব তবে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দুদিন কি না দুবছব পবে আবাব তো ফিবে আসবে। ইতিমধ্যে তোমাব গাছগুলো ত আব ববি ঠাকুবেব "হংস-বলাকা"ব মত ডানা মেলে আব দেশেব কিনাবা খুঁজতে বেবিযে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনযাব অভি-সম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কি না ?'

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলাব নেই। এব সত্যি বলতে কী, সেইটেই কামনা। আমাদেব মুনি-ঋষিবা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন। আমাদেব বাপ-পিতেমো তাই কবেছেন। মুসলমান মৌলানা-দববেশবা তাই বলেছেন। ওদেব বাচ্চা-বাচ্চাবা তাই কবেছে।

তাই শাস্ত্রকাব আদেশ দিযেছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পব তীর্থভ্রমণান্তে ('দেশভ্রমণ' কিংবা হালফিলেব কথা 'ট্যাবজম') স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবত গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তাবপব আব দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণেব বা-টি কেড়ো না। নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা কবতে হয়, তবে কব, প্রাণভবে কব, সন্ন্যাস নেবাব পব। এমন কী, বানপ্রস্থ যাবে জনপদভূমিব প্রত্যন্ত প্রদেশে ; সে অবস্থাযও যত্রতত্র পর্যটন গর্হিত।

কিন্তু সন্ন্যাসেব বাউণ্ডুলেগিবিব প্রতি কর্তাবা এত সদয় কেন ? তাব এক কাবণ ;

ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যাভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্বংবস্তু ভয়ান্বিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥

শুধ্ বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে-মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বানপ্রস্থ গ্রহণ গর্হিত ; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে—ডবল, ট্রিপ্‌ল প্রমোশন নিয়ে।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না। সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন জায়গাতেই তিন দিনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া। বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই 'বিনয়'।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয়, সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই, কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে-সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মত সংসারীদের নিশ্চয় আছে।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মত বাউণ্ডুলেপনা করুন, ফল একই। নানা দেশ নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছৃঙ্খলতা, বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই 'প্রসার'ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অন্যদিক দিকে আপন মাটি আপন গ্রামের কল্যাণকামনায় নিস্পৃহ। ইংরেজীতে একেই বলে 'জেডেড', ফরাসীতে 'ব্লাজে'। এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, 'পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন সুখ'। গ্রাম্য ভাষায় একেই বলে 'দড়কচ্চা হয়ে "ল্যাদা" মেরে যাওয়া।'

এইসব 'ভবঘুরে'রা তখন আর সমাজের ভিতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি অন্যায় বন্ধন থাকে, এক কালে হয়ত সেগুলোর কোন অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির বন্ধও থাকে। এ-দুয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ। আমাদের বাউণ্ডুলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন। সে ঘোরাঘুরির ফলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অন্য বন্ধন, অন্য মুক্তি। দেশের সমাজের মূঢ়তা যেমন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ।

আর যদি ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যার কথা তোলেন, তবে তার পরম শত্রু দেশভ্রমণ। গ্যোটে বলেছেন, 'চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।'

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো—'

'আর যদি ছবি দেখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিনে থাক তুলির টানে পড়ের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ-আনন্দ পাওয়া যায় না॥

'চুঙ্গিঘর, কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে 'কাস্টম হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল-আম্‌ট', ফার্সীতে 'গুম্‌রুক্' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভুতো সবাই সরকারী নিম-সরকারী, নিম-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো-কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। এই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হকের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুম্‌রুক্'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার 'গুম্‌রুক্'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন? ক্রমশ-প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সে-কথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন

সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'- তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ এ-যাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হকের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। ব্যস, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর উলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলুবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর এখনো পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁ-চিঁ করে বলবেন, 'এটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এতে ত ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে

সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যাবস্ট্রিপের পশ্চাতেব সুদূর দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টবে-টক্কা করবে। তারপব বলবে, 'পনেব টাকা।'

আপনাব মনেব অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আব তাব কী বয়ান দেব! ব্যাপাবটা যখন আপনার সম্পুণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ওই শার্টটার দামই ত মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটাব উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলাব কাছে তাব সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচাব করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাব জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। কারণ তাব প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনাব জন্মের সময় যে কাচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তাব সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমান ভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন

তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত নিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ-কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামখা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ- আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোন আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে

রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেয়ে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন, আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' বাইরে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডুদার বাক্স-পেঁটরায় এত সব তাক-বেতাক হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, গাধা চুঙ্গিওলারাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে

আমার কানে কানে বললেন, 'শেকস্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেকস্‌পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়- কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেকস্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইণ্ডিয়ান প্লেঙ্গটিন্স।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা [illegible] যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন সোনার [illegible] পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুম-জারি করতে [illegible]।

ঝাণ্ডুদা [illegible] বললেন, 'প্রাণের, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লণ্ডনে— নিহাতই চিংড়ি [illegible]। এটা খুললে [illegible] হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ট্যাটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

[illegible] বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লণ্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু ওতে তো বড্ড খরচা পড়বে। পাউণ্ড পাঁচেক [illegible]।'

দুস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন ত সক্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার

মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি ত আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়ান্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসি উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে —সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজীতে বললেন, 'নিশ্চয় তোমাকে এটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে এটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুইট্স কি না।'

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নিচে থেকে টিন কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় থেকে টিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু এই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? কেবল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদিতে ঝাণ্ডুদা ভূরি ভূরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসী জর্মন ইতালীয় স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু

যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে ?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ !'

জর্মনরা, 'রুর্কে !'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো !'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই, সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়াস্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়াস্তি।'

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন—বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী !'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের

উপব চেপে ধবে ক্যাঁক কবে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলাব কলার বাঁ হাতে আব ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা বসগোল্লা ওব নাকেব উপব। ঝাণ্ডুদাব তাগ সব সময়েই অতিশয় খাবাপ।

আব সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমাব গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্কবা পেয়েছ। পই পই কবে বললুম, বসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিবাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'— আবও কত কী।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘবে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমাব। চুঙ্গিওলাব গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেকচ্ছে তাব থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পবিত্রাণেব জন্য চাপবাসী থেকে আবম্ভ কবে ইলদ্যুচে মুসসোলিনী —মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিসটাব, অ্যাম্বসেডব— প্লেনিপটিনশিযাবি—সাববই দোহাই কাড়তে কসুব কবছে না। মেবি মাতা, হোলি মিসস, পোপঠাকুব ত বটেনই

আব চিংকাব-চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে বীতিমত বে-আইনী কর্ম। সবকাবী চাকুবেকে তাব কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন কবে তাকে সাড়ে তিনমনী লাশ দিয়ে চেপে ধবে বসগোল্লা খাওয়াবাব চেষ্টা কবন আব নাই কবন খাওয়াবাবই চেষ্টা কৰুন, কর্মটিব জন্য আকছাবই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এব চেয়ে বড অপবাধেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদাব কোমব জাবড়ে ধবে আমবা জনাপাঁচেক তাবে কাউন্টাব থেকে টেনে নামাবাব চেষ্টা কবছি। তিনি পদাব পব পদা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পবান আমাব, খাবি নি, ব্যাটা —' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমাব মাতৃভূমি সোনাব দেশ ভাবতবষেব ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘবেব পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডাবৰদাব, আস-সর্দাব বেবাক চাকব-নফব বিলকুল বেমালুম গাযেব। এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফবাসী উকিল আকাশেব দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত

চক্ষে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলছে, "ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস্। এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিন্দেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে 'মিরাক্‌ল্ অ্ব রসগোল্লা'।"

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম! কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু চার পাযণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বড় কষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিস নি, আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন রেটি লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-রেটিতে রিস্ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস-টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তার পর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, রিক্কো

ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়ত অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়ত কখনও ঘুষ খান নি। 'না-বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' ত হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়াস্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ ত বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও ত একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

'কিয়াস্তি' না রসগোল্লা সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

> 'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
> অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

> রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
> ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!!

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী, কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্য 'পণ্ডিত সম্প্রদায়' আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা, বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজলাভের উষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে।' এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা ওঠাতে' পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। 'আমরা খেতে পাই নে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা

তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এ সব বালাই-আপদ দূর করবার জন্য কী সব পরিপাটি ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈঃস্তব্ধ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর', এইবারে শুরু হবে উল্টো 'বারমাস্যা', এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি! কোথায় কী?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি 'খ য়ে র।'

মানে? এর অর্থটা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে বক্তা 'জাপানের ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জানজিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ওই 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্মা লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্তলং শব্দ মাত্রেণ যদি অর্থপন. কোঽপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন। শক্-টি মারাত্মক রকমের হবে। ছাপাখানায় সদব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্‌গে—অন্য কথা পাড়ি।' অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্-বাগড়ম্ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট,

মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ফ-ঝম্ফ দিতে পারেন। কারণ, 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়েব' বাক্যেব শব্দার্থ আরবী ডিক্শনারি ঘেঁটে বের করেও পুলি-পিঠেব ন্যাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়াব দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল'?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-বকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদেব পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতাবণা করার পব সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তাব সরল অর্থ, 'এ-দিককাব কথা বলা হল, এবাব অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন কবছি এবং সেইটেই আমাব বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নেব সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

'খয়েব'-এব এরূপ ব্যবহাবকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথাব' (কালামেব) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে-কথাব উপব ভব কবে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। বিপক্ষ বা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেল্লা ফতেহ্ কবে দিয়েছেন, ভাগিস্, আপনি, মোকামাফিক 'খয়েব' শব্দটি প্রয়োগ কবতে জানতেন, 'বাখে খয়েব মাবে কে?'

মুসলমানবা নাকি এদেশেব মন্দিব ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিক্-কাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নূতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি কবে ধ্রুপদ-ধামাব বরবাদ করেছে। কবেছে ত করেছে, তাই বলে কি উষ্মাভাবে গোস্সা-ঘবে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন? গড়েব মাঠে গিয়ে বাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সবকাবী ইশ্‌তিহাব পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার?') কী ভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না?

ওইটে ঠিকমত, তাগমাফিক, বাংলায় 'এস্তেমাল' করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগীশ, তাকিয়া (-ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিনা—কিন্তু কই, 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব ত কেউ করে না। কট্টর কান-ফাটা হিন্দীতে 'ভারতওয়ার্ষকী উন্‌তি ঔর সোওয়াধীন্তা, গঁড়তন্তর ঔর সামওয়াদ' ইত্যাদি ইত্যাদি 'কঠন্ কঠন্' (কঠিন কঠিন) সমস্যায়েঁ নির্মাণ করার পব সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন মোহমুদ্গবে ? সেই সনাতন—রাম! রাম!—সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ে-র দ্বাবা। এবং সেই 'খয়ের'-এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন্ ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ী মসজিদের সামনে জাকাবিয়া স্ট্রীটে কাবলীওলা 'খ' উচ্চাবণ করাব ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ 'লখ্' শব্দেব 'খ', জর্মন 'বাখ্' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন ?

মুসলমানবা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম কবেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়েব' শব্দের যে বিবাট বালাখানা তৈবি করে দিলে তার উপবে বসে হাওয়া খাবেন না ?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না ?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তাঁবা অপবাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে ? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি ?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের

হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পুজো-পার্টা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া একখানা খাসা তিলক কেটে দিলে। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্ডক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদগদ হয়ে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হরি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহারে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পরব ছিল বলে 'ইস্পিশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল ভাঁড়ের মা-কালীর মত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাঁট। ই রেজারাগীশ ছোঁড়ারা বলে 'পাইন্ট'। তিন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়ার্টারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে—বোতলবাসিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই 'ব্যাড' কোয়ার্টারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন

পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল।'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না, কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। তাতে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেন্স্।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদগদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্র মশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদুর, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাঁদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাজোড়া পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পৌঁছলেন নীচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে

নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জলদি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল?

খয়ের।

চাপরাসীদের মাইনে বোর্ডওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, বোর্ডওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা, সকলেরই যেন বোর্ডওয়ালের মাইনে হয় অর্থাৎ আই-জি.-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে —এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পেটিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপোর থালি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং আর সবাই রাস্তার পাথর ভাঙবে।' এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্য আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই, সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের

সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা, আণ্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫৲ মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫৲ পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না—তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অঙ্কশাস্ত্র এস্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।' ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘণ্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও ত চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগরেট আনা সরকারী কাজ নয়।' আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদ্দণ্ডেই বলবে, 'বহুৎ (উচ্চারণ 'বোহুৎ') আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!'

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগরেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগরেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যাবসা। ঠিকমত নোটিস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনী সিগরেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল শুদ্ধমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যাবসা করতে

পারবে না। কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে ছুড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগরেট বিক্রিতে দোষ কী? কিছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, তার ব্যাবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানী এ-ব্যাবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগরেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইন্‌সম্‌নিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদুহাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী?'

নাঃ! চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ। 'বৃন্দাবনকে কুন্‌জ্-গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদায় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্‌সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যাবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যাবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কম্বাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তম্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিওঁ?' দরওয়ান বললে, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুস্‌রেমে ঢাল; পক্‌ড়ে কৈসে?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে

পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারি ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে-কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুবে ঘুরে একটাও যোগাড় করতে পারি নি। অধম কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক অল্পয়াসে পাঁচটি বিয়ে কবতে পারতুম। চারটি আইনত—'হিন্দু কোড-বিল' আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, 'স্যর, আপনি যে চাপরাসীদের য়ুনিফর্মের জন্য দরদ দিয়ে পার্সনাল ইন্‌ট্রেস্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু স্যর, এদের য়ুনিফর্ম ছেড়ে সরকাবী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসিকলেব সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদেব পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন্ ব্যাবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, যুনিফর্মের সাফসুতরায়েব জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্' পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লীভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউণ্টেণ্টেব অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ শীট'খানা ঠিকমত টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউণ্টেণ্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী হুড়োটাই না খেয়েছিলুম! শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউণ্টেণ্ট হাফ ওয়াশিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক

যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন দিকে ভেসে যায়, সে-কথা আমি বলতে পারব না, তবে এ-কথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, 'তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল' স্পর্শ করে বলব, সরকারী নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই 'ওয়াশিং শীটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি। গিন্নী জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়াশিং-ওচাটন' আওড়ান।

কেরানী ওয়াশিং অ্যালাওয়েনস্ পায় না। য়ুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স্ হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয়। বুশ শার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখি, 'শ্যাবি।' আপনি হয়ত বলবেন, 'ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স্ আর ক'পয়সা?' বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক—দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

ওই য্-যা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চিত্তরাম বর্ষায় ছাতা এবং বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই ত চিত্তির—একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজেই তাকে এ-দফতর ও-দফতর করতে হয়—বগলে ফাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাসী বলে 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারী ফাইল বাচাবার প্রেমে নয়, দুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানী বলে, 'সরকারী কাজে খোওয়া গিয়েছে, ওটা 'রাইট অফ্' হবে।' দুধের স্মরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, 'তা বেরবার সময় দুধে জল দিস্ নি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।'

শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস মশাই বলতে পারবেন। তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার-ব্র্যাণ্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশ্‌তা বখরায় খায়-টায়। চৈতরাম দুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উহুঁ। দুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিটালে তারা দুখানা ঘরেব জন্য আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশ্‌কিল।

এই ত গেল মোটামুটি জরিপ। তার উপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা-আসটা। কোনও জিনিস বড় সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সব সময় ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যাবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে!

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মুক জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, 'সস্তুরমশাই, সস্তুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সস্তুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে।'

জামাই, গদগদ কণ্ঠে, 'আহাহা, ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এ রকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেণ্ট উচ্ছুগ্গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন॥

চিল্কা

সন্ধ্যেবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুড়ি তৈরি করার পর আজ এ-কুড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যেবেলার কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর আরও কত সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে হবার নয়, ফুল ফোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। সমস্ত রাত কুড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট-হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দার কাচ্চা-বাচ্চাদের কিচির-মিচির শুনে। আঙ্গুল-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাতে এসে পৌঁচেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের

সেই গোলাপ-কুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রঙ একটু বেশী লালচে। আমার আর পুব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোন রক্তাম্বরধারিণী গরবিণী চিল্কার উপর দিয়ে পুব সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে-কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্য রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মত এক একটি সূর্য-রশ্মি দিগ্বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পুব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র—ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপী হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাণ্ডু, যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব-আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচর ছড়িয়ে এবং হয়ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি

রঙ মেখে নিয়েছে। এ-রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের ব্লু ডানয়ুবেও নীলের এ-আভাস আমি কখনও দেখি নি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলুফরি রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপর্যাপ্ত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিবাট কালো পোঁচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পোঁচ আবার অল্প অল্প দুলছে। স্টীম-লঞ্চ ক্রমেই কালো পোঁচেব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভব করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই ত; এদেবই ত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়েব পায়েব কাছে, ডাউকির হাওরে হাওবে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃদপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলেব দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ ত সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগ্নী কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, ওই দেখ, চিল্কার

দেবী কালী-মাব দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই, তোমাব টাকেব মত সব কিছু খা-খা কবছে।'

টাকেব কথা ওঠাতে বিবক্ত হয়ে দ্বীপেব দিকে না তাকিয়ে তাকালুম বোষ-কষাযিত লোচনে, কৃষ্ণাব চোখেব দিকে। সেখানে দেখি চিল্কাব মাধুবী। কৃষ্ণাব চোখেব সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলুকবি হয়ে গিয়েছে আব তাব গায়েব কালো বঙ দিয়ে চোখেব চতুর্দিকে স্বযং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুব খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝবিণীব কলকল বোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আববেব মরুভূমিব বুক ফেটে বেবিয়ে আসা সুধাবসে, নবজাত শিশুব গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢেব ভিজে মাটিব গন্ধ।

বসময পাঠক, এইবাবে আমি তোমাব একটু করুণা ভিক্ষা কবি। আমি কাব্যবস ভিন্ন অন্য আবও দু-একটি বসেব সন্ধান কবি। তাবই একটি খাদ্যবস। চিল্কাব এ-পাখিব বস আমি চেখেছি দেশে। আবাব লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পাবিবুদেব বাজা। তাব এবং তাব বন্দুকেব দিকে মধুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কাব কালীকে স্মবণ কবে বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!' তাবপব ভাবলুম, না, অত বেশী চাওয়া-চাওযি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা ছত্তিন দিলেই হবে। আমাব খাই মাইজী বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইবানী গল্প মনে পড়ে যাওযাতে হাসি পেল। এক ইবানী দববেশ ভগবানকে উদ্দেশ কবে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজাব পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমাব কিবে কেটে বলছি, তাব থেকে পাঁচ হাজাব তুমান গবিব-দুঃখীদেব ভিতব দান-খয়বাত কবে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস কবতে পাবছ না? আচ্ছা,

তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। এদেব পোস্টাফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয় নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এবা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোবা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে, কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে, ফুটপাতের দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদিবাসীবা মাঝে মাঝে বন্য থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদেব জীবনকে আবও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিষপত্র দিয়ে তাবা মাছ ধবে, দু হাজাব বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তাবা মাছ ধরেছে। সভ্যতাব শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানেব প্রসার এদের কোনও কাজে লাগে নি।

হয়ত ভালই আছে। ফার্সীতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে, ভালই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধু-রেখা আর কোথায়ই

বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পুব-বাংলার পাড়াগাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম। মাছরাঙা গুড়াগুড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব-বাংলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয়; তাই খেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়য়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক, এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা, দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদ্দল কার্বার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আরও কত কী! এসব এই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তারপর কত চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রানী। আর আজ সকালের মত আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে

গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অনুরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হাল্কা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানি নে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের, কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন—কিংবা নীল চশমা—পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল এই হরতন, চিরতন, রুহিতন, ইশ্‌কাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু রঙ না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেল্‌কি-বাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটে নি—একেবারে সম্পূর্ণ

নিখিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিকনির মত ইন্দ্রপুরীর কোন এক রমণীর দীর্ঘ বিন্যস্ত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, কিন্তু এ-গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিকনি বেশীদূর এগতে-না-এগতেই দেখতে পাই, দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একটানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তার নীল কপালের সিঁথিতে এক ফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তারপর তাঁর খোকা কচি হাতের এলো-পাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনী হয়? তাই বোধ হয়। হ্রদের জল বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরোর রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস-জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ গানের রেশটুকুর' উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানী বরস্‌তা এক ঘণ্টা, তো ছৎ বরসতী দো ঘণ্টে'--'জল যদি বর্ষে এক ঘণ্টা ত ছাত বর্ষে দু ঘণ্টা!'

দু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু-একটা মার না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে সুস্থে বলেন, 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরে সুস্থে কেস খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো।' ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরী তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমত মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম ? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মত শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হল। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্চে ? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ ত ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায় ?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আম-বাগানের ভিতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। আঙ্গল-আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার

গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজানাতে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আম গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজাবে, পুবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যে সব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমনি ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কূলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কি কবিতাই না রচেছিলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।
তাই ভাবি মনে—'

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিই নে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শান্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য ছোটে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায় —হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? 'তার জীবন' কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন ত এখন দৈন্যের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

কিন্তু থাক্ এসব অপ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, আপনারা শাঁক বাজান আর না-ই বাজান 'মম চিত্ত মাঝে' ঘন ঘন শাঁক বাজছে।

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—না? তবে কিনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সে-দিন পরব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার

সহৃদয় পাঠকবা আমাব ভ্যাচব ভ্যাচব কিঞ্চিৎ ববদাস্ত কবে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেও তাব ব্যবস্থা আছে। আমি স্মার্ত নই, তাই আবছা-আবছা মনে পডছে, কেউ যদি চৌদ্দ বৎসব (কিংবা সাতও হতে পাবে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তাব শ্রাদ্ধ কবতে হয়, কিন্তু তাবপব যদি হঠাৎ সে ফিবে আসে, তবে তাব জন্য নূতন কবে জন্মোৎসব ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম কবতে হয। তাকেও মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটিব মত দু মুঠো বন্ধ কবে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হওযাব ভান কবতে হয, তাব নামকবণ, চূডাকবণ, এমন কী নূতন কবে উপনযনও হয। মনে পডছে না, তবে বিবেচনা কবি, ব্রহ্মচর্যেব পব তাকে পুনবায তাব স্ত্রীকে বিয়েও কবতে হয— বিলিতি ধবনেব সিলভাব, গোল্ডেন ওয়েডিংযেব মত — তাতেই বা কী কম আনন্দোল্লাস, অবশ্য সব কিছুই হয ঘণ্টাখানেকেব ভিতব। এসব-দু'টো ব্যবস্থাই আমাব বডই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ কবে যখন বাচ্চাটিব অর্থাৎ লোকটাব মাযেব ছবি মনেব ওপব ভেসে ওঠে। ববীন্দ্রনাথেব ভাষা একটু পবিবর্তন কবে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূ-বেশ পবে সীমন্তেব উপব অর্ধাবগুণ্ঠন টেনে নিয়ে অন্যান্য অন্তঃপুবিকা কুললক্ষ্মীদেব ন্যায প্রসন্নবদনে মুখে মাঙ্গল্য বচনায নিবতিশয ব্যস্ত হন না?

কিন্তু হায় যাব মা নেই?

দিল্লি ভাল জাযগা, ভালবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানেব কাছে বেলগাডিতে ঘুম ভাঙল। আগেব বাত্রে যুক্তপ্রদেশেব কোন নাম-না-জানা জাযগায ঘুমিযে পডেছিলুম মনে গভীব প্রশান্তি নিযে যে, পবদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাংলা দেশে। তাই না জাগলে আমি হাওডা পেবিয়ে, শেয়ালদা ছাডিয়ে যে কত কহা মুল্লুকে চলে যেতুম, তাব খবব কি আই, বি, পর্যন্ত বাখতে পাবত? ডাক্তাববা বলেন, মনেব শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদাযিনী— ওনাবা ইংবিজিতে বলেন বলে আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃত-ঘেঁষা কবে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানেব

কাছাকাছি ভাঙল সে-কথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাংলার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না—বাংলা প্ল্যাটফর্মের রদ্দী চা-ও দিল্লি-লাহোরের উত্তম উত্তম খানদানী পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাংলার চায়েব খুশবাই ঘুম ভাঙাল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাংলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহার ফুস করে বাংলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গ-সভার মহাঙ্গন থেকে' 'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে' এক মুহূর্তেই 'শ্যামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাঁতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না? এমন কী, গেল রাত্রিতে যে-লোকটা আপনার কামরায় ঢুকে উপরের বার্থে শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' ভেবে অবহেলা করেছিলেন, সে-ব্যক্তি বর্ধমানে পৌঁছে দেখবেন দিব্য বাংলা বলতে আরম্ভ করেছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ে পড়ে বলবেন, 'এক কপ চা হবে স্যার!'

পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড়ডিসার, এদের স্যুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে, র-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ি ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা এক-বিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—এরাই বাঙালী।

দিল্লির লোক একদা রুটি মাংস খেত; এখনও তারা রুটি-মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালীরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না! রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাদ্য চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে

বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে যে-নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল—আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম—যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভাণ্ড নিয়ে বাংলা দেশে অবতীর্ণা হয়েছেন! ছেলেবেলায় দেখেছি, উদ্বৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়াবার জন্য তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্য সার তৈরি করা হয়েছে! যাঁরা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালী, এরাও বাঙালী।

এককালে এ-দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবী-ফার্সী জানতেন। উনবিংশ শতকে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে নেই—সে এমারত গড়াতে চুনসুরকি জোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবী-ফার্সী, আজ সে-সৌধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালী মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই দু মুঠো অন্নের জন্য সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে এ-কথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার পীঠভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্য চেল্লাচেল্লি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না।)

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।

তবুও এই বাংলা দেশ।

এখনও ধুলো কমে নি, সে-ধুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাংলা দেশ এখনও আরম্ভ হয় নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ভরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি—কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের লাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ক্ষণেকের তরে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম, তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ হেমন্ত, এমন কী, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটি মাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বিলিয়েছি হাসিমুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, ক্ষণেকের তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছি, কিন্তু বিরক্ত হই নি। ঘরে এসে কলসীতে তাদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি যতদিন পারা যায়। তারপর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে—আজ সকালে একজন, কাল সকালে দুজন। বুকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব-কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু এ-প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা ? একেই ত জ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নূতন করে ফুলের সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেলার ম্লান মৃদু গন্ধে বিধুর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি ত হতে পারলুম না!

তারপর কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেশীক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারি নি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন মতামত। আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেষটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।'

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে

সুকুমার রায়

—০—০—০—০ —০—০—০ —০ —০—০—০—০—০—০—০—

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা খাসা নেমন্তন্ন পেয়ে গেলুম।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'হরবোলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে। এদের উদ্দেশ্য হাস্যরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালীর হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্যরসকে আবার বইয়ে দেওয়া। হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি, 'হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালীর)। সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে।' হরবোলা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদের প্রথম পালা দেখতে।

সুকুমার রায় যে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকের থিয়েডার', তার উপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তারা যে রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সিরিয়স নাট্য কী-ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না প্রতি শব্দে রস আর রস। নট যদি সেখানে ভার অভিনয় নিয়ে সে-বস শুধু প্রকাশই করেন, তবে ত আর কোন হাঙ্গামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে 'থিয়েটারি' (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্যরসঘনকে ঘনতব) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয়। সুকুমার রায়ের রচনা হাস্যরসে এতই কানায় কানায় ভরা যে, তাতে কোনও কিছুই যোগ দিতে গেলেই, তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগল্‌ভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়াব জন্যই বাস্টাব কীটন হামেশাই প্যাঁচাব মত মুখ কবে হাস্যরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলেন তাঁব অভিনয়ে যৎকিঞ্চিৎ 'থিয়েডাবি' এনে হাস্যরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভবাট করে তোলেন, কিন্তু এ দুজনেবই সমস্যা হববোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাকশেন নিয়ে—কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ 'পিয়া মিলন কো' গিয়ে খাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন। কাজেই তাঁব অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সুকুমার রায়ের বসিকতা সূক্ষ্মতব, হাস্যরসেব জগতে সূক্ষ্মতম বললেই ঠিক বলা হয়, সে-রসিকতা প্রধানত ভাষায় এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনায়। অভিনয়েব ভিতর দিয়ে তাকে বাহ্য রূপ দেওয়া, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) ত সহজ কর্ম নয়। করিই বা কি প্রকারে? বাস্টার কীটনের মত প্যাঁচা-ঢঙে, না চার্লির মত একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

'হরবোলা' সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা 'সকের দল' গড়েছেন। কাজেই তাঁরা একসপেরিমেণ্ট করতে ভয় পাবেন না জানি, সেই আমার ভরসা। আঙ্গিক নিয়ে ধোকা থাকলেও এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে-আঙ্গিক ব্যবহারে অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁরা যদি সুকুমার রায়ের আসছে পালা কীর্টন-আঙ্গিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট করে করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন আঙ্গিক সুকুমার রায়ের হাস্যরসকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করার উপযুক্ত।

'শব্দিশেল'এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত কাজেই এস্থলে তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপরাধ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির-যত্ন করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তকরণে 'হরবোলা'র হররকং হরেকরকমের উন্নতি কামনা করি।

সুকুমার রায়ের মত হাস্যরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসী, ইংরেজী, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনি নি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্‌ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয় —স্ব-শ্রেণীর না হলেও। ঠিক সুকুমারের মত তিনিও অল্প কয়েকটি আচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মত আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইয়োরোপে অভূতপূর্ব সে-কথা 'চকুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশীর ভাগই ঘটনা-বহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল' ; তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই—আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-রকম শুদ্ধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশন নেই, গল্প নেই অর্থাৎ আর-কোন দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ-জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এঁদের অনুকরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা জর্মন কিংবা বাংলার কেউ কখনও করেন নি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার ত কথাই ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'বোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই—অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হয়েছিল অস্বীকার করি নে) এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম (আমার ঠোঁটে কিংবা চোখে নয়—অনুবাদে)।

ফরাসী কাফেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হররাতে আমি পদে পদে বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বারবার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম, 'তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশী গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ—আমার বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি ত ঘেমে কাঁই।

তারপর একজন বললেন, 'এরকম weird, ছন্নছাড়া, ছিষ্টিছাড়া কর্মেব ফিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনি নি।'

আবেকজন বললেন 'ঠিক। এবাব একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ-লিস্টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না!'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধবে আকাশপাতাল হাতড়ালুম, দু-একজন একটা দুটো অদ্ভুত কর্মেব নামও করলেন, কিন্তু আর সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ডিসমিস কবে দিলেন।

আমবা জন পাঁচ প্রাণী প্রায় আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি কবেও একটা মাত্র জুৎসই এপেন্‌ডিক্‌স পেলুম না! গোটা কবিতার ত প্রশ্নই ওঠে না।

আগেব থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবাব নূতন কবে উপলব্ধি কবলুম, যদিও সুকুমাব বায স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয চেষ্টায়', যে-জগতে সুকুমাব বিচবণ কবতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীযম্।

সিগনেট প্রেস সুকুমাব বায়কে পুনবায বাঙালী পাঠকেব সামনে তুলে ধবেছেন বলে বাংলাব ভিতবে বাইবে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা কবছেন। আমিও তাঁদেব সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমার বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পাবেন সুকুমাব বায়ের অন্যান্য গদ্য পদ্য লেখা যেন পুনবায় প্রকাশ কবেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'এব ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাশু'কে পেয়ে যেন লর্ড লস্ট্ ব্রাদাবকে পাওয়াব আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধবেছি, কিন্তু তাব আব সব ভাই-বেরাদববা কোথায়? তারা যেন আব বেশীদিন আত্মগোপন না কবে।

দু-একটি অসাবধানতা লক্ষ্য কবেছি, তাবই একটা এ-স্থলে নিবেদন কবি।

'খাই-খাই' কাব্যেব 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলাব ডাল পথঘাট জুড়ি।

মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু ছুটি
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি
বীরোচিত ধীর পদে এসে দেখি ত্রস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।'

অথচ আমাব অর্ধবিশ্বাস্য স্মবণশক্তি বলছে :—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলাব ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বব যায় দেখ মুদি চক্ষু ছুটি
"কাবো কিছু চাই" বলে, তড়বড় ছুটি।
হঠাৎ ডালেব পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড়ি পড়ে কাবো নিবামিষ পাত্রে।
বীবোচিত ধীবপদে'—ইত্যাদি ইত্যাদি

'হঠাৎ ডালেব পাঁকে' ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

কিন্তু থাক্, আব না। সুকুমাব বাযই বলেছেন :

'বেশ বলেচ, ঢেব বলেছ
ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটেব মাঝে ভাঙবে কেন
বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি॥'

পুব-বাংলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা এক লপ্তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ-কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোন কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোন লেখক ওঠান নি। পুব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, 'ক'রে' শব্দকে 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইডিয়মে—অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতিখেলা যে polo খেলা সে-কথা বাংলা দেশের কম লোকেই জানেন, (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

'দুষ্টু লোকের মিষ্ট কথা,
দিঘল-ঘোমটা নারী

পানার তলর শীতল জল
তিনই মন্দকারী।'

'কামুক্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোন বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ-গুণটি ঢাকা শহবের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাংলা এবং পশ্চিম-বাংলাবও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেণ্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা, বহু শহবে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকাব কবি লখনউ, দিল্লিতে (ভাবত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক। কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকাব কুট্টিব কাছে। তার উইট, তার বিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টিব সঙ্গে ফস্ করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পবিচিত রসিকতা দিয়েই আবম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অবন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকেব চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিম-বাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী, 'রমনা যেতে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে ত দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে এক সঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সবশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া ত নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসাপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'বিয়েল, হেলথী, অপটিমিজ্‌ম।'

কিংবা আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো রঙের কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি

কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখর-খানী (বাকির-খানী) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখব-খানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা কবি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীব মতই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তাব নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোন কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিযে নিয়ে সাহিত্যেব পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-বকম পশ্চিম-বাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার কবে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যে-বকম একদা কলকাতাব নিতান্ত ককনিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমাব দিকে, কিন্তু খবচের দিকে একটা বড় লোকসান আমাব কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন কবি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপবিচিত কিংবা বিদেশীব সামনে এমন ভাষা বাবহাব না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালীব সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘবোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পাবে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তাব, ইলাহি, বেলেল্লা, বেহেড, দো গেড়েব চ্যাং এ-সব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালীব সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহাব কবে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক্-আড্ডাতে পুব-বাঙালীর সংখ্যা

থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্য-ভঙ্গী বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত এরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জম-জমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল ভাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে-বাংলা যে কত মধুর এককালে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলা সাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্য ভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান' ঘুমুলে? মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালীই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি

পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলায় অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টারালাপ্ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ-গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি?

হায়, এ-শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের উপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বলেন, 'প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণার জন্য যাহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করিতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী কালে দার্শনিকগণ যে-সমস্ত কথা লিখিলেন, তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে-সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই হইল না।'

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই; এখন দার্শনিকদের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজীর মূল বক্তব্য।

এককালে 'ক' ছিল এখন 'খ' হয়ে গিয়েছে, সে-কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না. অতএব দেখতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ-কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধানে লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকরাজি আজ অবোধ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ যাবৎ, কি এদেশে, কি বিদেশে, কেউ ত দার্শনিকদের এ-রকম সন্দেহের চোখে কখনও

দেখে নি। ববঞ্চ বেশ জোব দিযে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চবম সত্য ছাড়া অন্য কোনও জিনিসেব সন্ধান কখনও কবে নি—ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুবি কবাব ক্ষমতা যাব আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যযনে মন দেবে কেন, এসব ত কবে অন্য লোকেবা। এক দার্শনিকই তাই দুঃখ কবে বলেছেন,

প্রতাবণাসমর্থজনে বিদ্যযা কিম্
প্রযোজনম্।

অর্থাৎ যে প্রতাবণা কবতে জানে তাব বিদ্যাব কী প্রযোজন। তাবপবই তিনি আবাব বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

প্রতাবণাসমর্থজনে বিদ্যযা কিম
প্রযোজনম।

কিন্তু এবাবে প্রতাবণাসমর্থ শব্দেব সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতাবণা + অসমর্থ দিযে, অর্থাৎ তুমি যদি প্রতাবণা না কবতে জান তবে বিদ্যে নিযে তোমাব কী কাজ হবে?

তাই বিদ্যা বিদ্যাবই জন্য, দর্শন দর্শনেবই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানেবই জন্য। সত্য নিরূপিত হলে সেটা যদি তোমাব আমাব কাজে না লাগে তবে সেটা সত্যেব দোয নয। শিবলিঙ্গ দিযে যদি মশাবিব পেবেক ঠোকা না যায তবে সেটা শিবলিঙ্গেব দোষ নয।

মানুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্যেব সন্ধান পায নি—পেযে থাকলে তাব আব অবনতি উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানেব হাতে, মানুষেব কাজ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা কবা সেই সত্যেব যতদূব সম্ভব কাছে পৌঁছনোব। তাই কবতে গিযে তাব প্রচেষ্টাব ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয তবু তাকে সত্যেবই সন্ধান কবতে হবে।

এ-স্থলে আবেকটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবাব ভাব কাব হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহবণ নেওয়া যাক। এটম বম বানাবাব সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কবলেন। তাবপর এটম বম্ বানানো হবে কি না এবং হলে পব সেটা হিবোসিমাব

মাথায় ফাটানো হবে কি না সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাদরেলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটম বম্ বানানো হোক আর নাই হোক, এটম বম্ ভাল কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম্ তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সূত্র আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য--বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। সে-সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অন্যকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজপতি এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজী দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চির-সংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।' যদি বা এ-মন্তব্য স্বীকার করে নি, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কিনা সে-কথা স্থির করবেন সমাজপতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে-নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন।

এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সব কলা-শিল্প ধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পুজো করছে কি না, তিনি সুন্দরের রূপ দিয়েই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেছেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের

আপন রচা সার্থক নৃত্যের বেশীর ভাগ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ-অপবাদ দেয় যে, এদের কলা-সৃষ্টি প্র্যাকটিকাল নয়, রবীন্দ্রনাথের গান 'একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়', উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতক-গুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস!

মোদ্দা কথা এই, যাঁরা 'ধর্মপ্রাণ' তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ-প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আসুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যাঁরা 'হা ধর্ম হা ধর্ম' করেন, তাদের অধিকাংশই (বাজাজীর কথা বলছি নে, তিনি সত্যই ধর্মপ্রাণ কি না সে-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে? আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

এতএব সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই।

সে-ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ ঋষি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ রকম ভগবৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

'একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে

পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেঁকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্না ও হাসি পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তাহার পথ অবলম্বন কর—ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা ত আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই, কোতোয়ালের প্রতি মহারানীর (ভিক্টোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, 'কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে।' বৈরাগ্য ত আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র, বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত, চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকার্যে ষোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য, দেখিতেছ না—একটা কেরানীগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা, সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, সাধনা—প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য প্রবন্ধ, পৃ ১—২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে 'বৈরাগ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'ধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে॥

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ-কথা ভূ-ভারতের তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোকছোঁকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ইংরেজী প্রবাদে যাকে বলে 'ডগ্ ইন দি মেঞ্জার' নয় 'ডগ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার।' ইংরেজ নিজে অনুন্নত পার্বত্যজাতির ভিতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অন্য উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করে নি এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের বহু পূর্বে। নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন 'কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী'গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা-সরস্বতীর পিছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোরার মত শক্তি আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু-চারখানা বই ইংরেজ আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা—নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টিবিন্দুর সন্ধান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভিতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম

থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রীষ্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছে, খ্রীষ্টের অনুকরণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানি নে কিন্তু যদি থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ এঁদেরই মত।

কিন্তু সেই মহান ধর্ম প্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রীষ্টের নামে যে-বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অজ্ঞের স্কন্ধে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করাতে পারে সে-তত্ত্ব হজরৎ মুহম্মদ (দঃ) জানতেন বলেই বলেছেন,

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

যে-মিশনারি এসে আসামের বনের ভিতর বাসা বাঁধল তার বাংলো দেখে আমারা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

'ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে,
পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে বেলের কাছে,
ইষ্টেশনের বাবু থাকে,
আহা ওরা কেমন সুখে আছে॥'

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, ঝকঝকে তকতকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো--মনে হয়, আহা, পাদরী কেমন সুখে আছে।

যাদের ভিতর পাদরী সাহেব খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে. সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু বিলেতের যে-কোনও মজুরের বাড়ি পাদরীর বাসার চেয়ে অনেক বেশী আরামদায়ক, মজুর, পাদরী সাহেবের চেয়ে খায় ভাল এবং পাদরীর সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী

বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে অনাত্মীয়ের মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

'আপনার জন আপনার দেশ
হয়েছি সর্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি,
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।'

কিন্তু এটা হল পাদরীর হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরী আপন দেশের তুলনায় যত দৈন্যেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভাল এবং চাষাভুসোদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরী পার্বত্য অনুন্নত জাতির ভিতর গিয়ে বাংলো বাঁধে।

অনুন্নত জাতি বুঝতে পারে না যে, ক্রীশ্চান হয়ে গেলেই সে-পাদরী সায়েবের বাংলো ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি-ঘর-দোর, জামা-কাপড়, বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফলে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টাণ্ডার্ডে পৌঁছনোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না—দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এই সব অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল 'লেসে ফ্যের' অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ-পদ্ধতিতে কোন-প্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অনুন্নত সম্প্রদায়কে যত কম ঘাঁটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত, সরল ও নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপন করে যে, আমাদের 'সভ্যতা' তাদের জীবনে নূতন কিছু ত আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারের দৈন্য দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অন্তত একজন অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধান-কল হয় নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সরল অনাড়ম্বর সাওতালদের জীবনধারণ-পদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভিতর প্রচার করলে ভাল হয়। সে-ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অন্যান্য ব্যাধি যাঁরা নির্মূল করতে চান, তাঁরা হয়ত সহজে আমাদের 'লেসে ফ্যের' পন্থা মেনে নেবেন না।

উত্তরে আমার নিবেদন, এই সব অনুন্নত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করার পর বিস্তর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে—অবশ্য ততদিন বেঁচে থাকলে আমি তখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর 'সভ্যতা'র মিশনারিদের ভিতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম॥

মার্কিনী তাত

মার্কিনরা হন্যে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কমুনিস্ট-জুজু দেখে। দেশে যে-রকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে-তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদেশের কর্তাব্যক্তিরা এ-রকম মারধোর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মুলুকে কিন্তু কমুনিস্ট-ডাইনী পোড়ানোব ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন ওই দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

তা তারা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

'হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি দুচারখান,
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে।'

কমুনিস্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায় আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে, তখন আমি

বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তমুক 'গণতন্ত্র' 'নবীন জীবনপদ্ধতি' দর্শনের নব সূত্রপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ—যে-কোন বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা শিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, 'এস ভাই ভারতীয়, তোমরা আমরা সবাই মিলে রুশকে ঘায়েল করি।'

ইংরেজীতে একেই বলে 'ওয়ার-মঙ্গারিং', বাংলায় বলে, 'তাতানো', 'ওসকানো', 'খ্যাপানো'।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাই নি। অকালে বৃষ্টি নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাশী-আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই 'তাতানো'টা ধরতে পারল না। যে-রকমভাবে তারা বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, 'সায়েব তোমার আসল মতলব, আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি—নয় কি? ঠিক বুঝেছি ত?'

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, 'বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অসম্ভব নয়"। তাই তিনি কোন দলেই ভিড়ছেন না।'

সায়েব বললেন, রুশরা চলে যাক চেকোশ্লোভেকিয়া হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোলাণ্ড ছেড়ে। তারা কী রকম সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্বপ্রকার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা?' এবার আমি পাল্টা একগাল হেসে

বললুম, 'বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল ত, তোমারই রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান পৎসদামে এসব দেশ রুশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এতই গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন ধরনের রাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম-জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে, না নিজেদের প্যাটার্ন? তা নয় সায়েব, রুজভেল্ট চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশ-নাগর বলকান-সুন্দরীকে নিয়ে কোন রঙ্গরস করবেন। কিংবা বলতে পারি, শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে মুর্গীর খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।'

সায়েবের মুখ সেদ্ধ হ্যামবর্ণ, সেটা নিপস্টিক হল কিনা বুঝতে পারলুম না - চোখে চশমা ছিল না। তবে কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। বললেন, 'তোমরা গণতন্ত্র মান। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

বললুম, 'তাতে করে ত আমরা মার্কিনেরই অনুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯১৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধন্না দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, "ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার।" শেষটায় ঢুকেও বেরিয়ে পড়লে। লীগ অব নেশনসে যোগ ত দিলেই না উল্টে তার খয়েরখা উইলসনকে তাড়ালে। তারপর ১৯৩৯ সালে যখন চেম্বারলেন চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লম্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্লহারবারের আঁতে যখন ঘা পড়ল, তখন "গণতন্ত্র বাঁচাবার" টনক নড়ল। এখন দেখছ রুশ বড্ড বেশী তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাইতে এত শিরঃপীড়া। সে-কথা থাক্। কিন্তু এ-কথাও মানবে যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, জাপান লড়াই করে করে মরল, তাই আজ তোমরা

পয়লা নম্বর। এবার তোমরা আর রুশরা মারামারি করে দুবলা হও তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।'

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি ?'

আমি বললুম, 'সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙালী ডাস্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে ; তাই বলে ওটা তার কর্তব্য এ-কথা ত কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরী হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা ; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে "কর্তব্যবোধে" "গণতন্ত্র বাঁচাতে" যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে! দেশ ত আমি চালাই নে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেক রকম চিড়িয়া নানারকম মুখোস পরে এদেশে এসে 'ওয়ার মঙ্গারিং' করে, তাব কি কোন দাওয়াই নেই ??

বাঙ্গালী মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তোরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন; কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নভেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তোরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মত চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি, সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তারা বাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না-ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল— এ-তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভাল না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্ কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতী মাস্টার্ডের উপর সরকার যা ট্যাক্সো লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশী।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতী মাস্টার্ড ; চালান দেশের তৈরী খাঁটি, প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মত তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশী বিলিতী কোন মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিতী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসী মাস্টার্ডে বদ্‌খদ্ মিষ্টি মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সক্কলের গায়ে দর্শনেব হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক কবি নে, তত্ত্ব কাবে কয় তার-ই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দিব খেই ধবে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমবা আপন জিনিসেব সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দীতে যাকে বলে 'ঘবকী মৃর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্‌সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালী-রান্না খাবাব রেস্তোরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালী নিমন্ত্রণ কবে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালী-বান্নাব সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল, কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালী-রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজী (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতী ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য—খাওয়া না-খাওয়ার

জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্‌ সুয়ে ইডলি-ডোসে কড়হী, ফরাসী এস্‌কেলোপ ত্থ ভো ও শাতোব্রিয়াঁ, এমন কি ভিয়েনাব ভীনাব শ্লিৎসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু ঘ্যাঁট, অম্বল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালী-রেস্তোরাঁ খুললে হয় না ?

বাঙালী সর্বভুক। তাই বাঙালী প্রবাদ 'লোহা খাই নে শক্ত বলে, '—' খাই নে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তোরাঁয় সব কিছু থাকবে ? উহুঁ ! আমাদের মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকী যে-সব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে ?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালারও ব্যবস্থা থাকবে, নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলাপাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্‌ আর নাই থাক্‌—চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী (বাদ দিলে চলবে না, পুব-বাংলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না ত ? ভেবে দেখুন। এ-মেনু' তৈরি করা ত একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয় , তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তোরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসী কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা-সম্পূর্ণ। ফরাসী 'মেনু' আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-

লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অর হ্ব অভ্র, স্যুপ্, ডিম, ফিশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো :—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুম কালে)। এই বারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া —করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাংলা দেশে নেই।

৩। ডাল :—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দু ভাগ —প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাটা ; কিংবা আ ল। নাবকোল, অর্থাৎ ডালে নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা :—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কাবণ এতক্ষণ দিব্য নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিবামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকাবেবই হতে পারে। অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো ··

(খ) ডিমভাজা, মমলেট···

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা···)···

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছে'র অনুচ্ছেদে পুনবাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্স্' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তাহলে 'মেনু' হয়ত জর্মন ডক্টরেট্ থিসিসের প্রকার এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরী মালে ত ও-জিনিস ওতরালে চলবে না।

(৪) ছেঁচকি—ছোঁকা—ছক্কা—চড়চ্চড়ি—লাবড়া (লাফরা)

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করি নে। আর-পাঁচজন কান পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কান-মলা খাই নি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী ?

করে করে আসবেন, মাছ, মাংসে—তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব ; একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন। এবং রেস্তোরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালী মেনু তৈরী করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশী কাগজ নিতে পারবেন না, কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায় টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভাল। কারণ 'কস্‌টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তোরাঁ-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'এক্‌স্‌ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা· ·), আচার (আম, জারক নেবু···) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন॥

খবর এসেছে লণ্ডনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই ত আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশী বিদেশী নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারী' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালী লেডিকেনি খেয়েছি (সেফ্ পেল্লাদ-মারা গুলি—প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লীর বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানীর স্বহস্তে তৈরী চেঙ্গিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণ-কৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব!

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে?

লণ্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালী, কাজেই বাঙালী হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন? কে না জানে, আজ বাঙ্গালী সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি শনৈঃ

শনৈঃ কমে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের পালা-পরবে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধনযজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালীর ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না ?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালী, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালী-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষেবাটায় মাছের ঝোল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালীর অন্যান্য রান্না নিয়েও আমার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালী হেশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঁঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনি-পাতা দই, মিহিদানা, সীতাভোগ আরও কত কী ! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এ-সব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।)

এমন কী, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের— এমন কী, বাংলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো

জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাকা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পুব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (এক রকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালাই কিংবা করকরে কই মাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিঁটকাচ্ছেন ত? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোক্‌ট-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালী-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্‌-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালী রাঁধতে জানে না (বাঙালীর উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশ্‌ৎ, মটর-গোশ্‌ৎ, গোবি-(কপি)গোশ্‌ৎ বাঙালী বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাব-বাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাব-বাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভাল রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গী-ঝোল রাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসীরা; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গী-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না!

মাত্র একটি বাঙালী কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত সুখাদ্য আমি এ-জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোন ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মত দু-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সুপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরীমুর্গী, মুর্গীমুসল্লম, মুর্গীশাহী, রওগন যুষ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবী গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কীমা এবং তার থেকে কোফতা-ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এক কথায় আমরা বাঙালী যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কিবাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালী রমণীরা লণ্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন কী করে?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ নগরের পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও ত ফেলনা নয়। মাছটাকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন?

গুজরাতীদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল্ অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখোরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে। মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠীদের দহি-ভাত। বেহারীদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি সূপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরীদের বসন্ত ঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লস্সী আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টিমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগার জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভাল ব্যাট্স্ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমন কী, না-ব্যাট্স্ম্যান না-বোলার শুদ্ধমাত্র ফীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে॥

'বাঁশবনে--'

—o —o—-o —o-—o—o—o —o—o — o —o—o-—o-—o—o—

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজন-রসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয় দিল্লি, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্।

প্যারিস-গুর্মের কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন —গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি ত আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া আসেন নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে ?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও

খাই নি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষ লাভ করেছে।'

এবম্প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু...'

সবাই বললে, 'কিন্তু...?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে, 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের– '

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনা কালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমার বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস্ অব উইনজার কখনও সুপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মানুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস-ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গী'—তদভাবে উস্টার সস্ + চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে এক চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো + প্রয়োজনীয় নুন। এসব

ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্‌ ৷ রেস্তরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল্ দোৎ (table d'hote) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) রোস্ট মাটন, (৩) পুডিং ; আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্‌ড্ ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং ; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্‌ড্ ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্‌ল্ দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য তোমাকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। ওই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ সুপ তার বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস্-হোটেলে তাব্‌ল্ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে ; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়ত খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ' —তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আবেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুবই নাম পাবেন জর্মনে— —'ভিনাব 'স্নিৎসেল্',। 'স্নিৎসেল্' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংবেজীতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসেব টুকবো'। ওটা কিসেব মাংস তাব কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়বেবও 'স্নিৎসেল্' হয়, চীনদেশে হয়ত কুকুবেবও হয। শুনেছি, আমাদেব মুনিঋষিবা গণ্ডার খেতেন। অনুমান কবি, তাঁবা তা হলে গণ্ডাবেব 'স্নিৎসেল্' খেতেন।

আমি ইংরেজী জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়বের মাংসের নাম ইংবেজীতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ্' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মবক্ষা কবেছি। তাব পব একদিন আবিষ্কাব করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়বেব মাংস, এমন কী ওই মাংসেব কটলেট, সসেজও হয—এবং মেনুতে তাব উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কাবেব পব অহোবাত্র জলস্পর্শ কবি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না'। কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পাবে।

কিন্তু ইংরেজী রেস্তরাঁ বাবদে আমার আপনাব বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদেব ভিতব আকছাবই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীব জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজিব কবে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিবীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুবস্ত বিলেত

ফেরতাকেই এ-ক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয় —তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নির্ঘণ্ট যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিলটিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এন্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্রি পার্ট, এক্সেপ্ট্ ইন দি হর্ন—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভ্রিথিং এক্সেপ্ট ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লির মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানী নান্। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্-রুটির (ফার্সীতে 'নান' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্-রুটি' তাই হুবহু পাঁউ-রুটির মত, কারণ পতুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিস্প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্য 'চীজ্ অ্যাণ্ড বিস্কিট্'ও খাওয়া যায়।) এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়াব পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্‌ন)এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমবা পাঞ্জাবীদেব এই 'তন্দুরী ফিশ্' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন। এতে প্রায় কোনও মসলাই ব্যবহার কবা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ কববে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন —ছুরিকাঁটাব পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশ্‌বী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্‌তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডাব দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপবোল্লিখিত এক, দুই তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাতাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও বেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও, এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যারা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌ৎ—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণত মটনের হয়)—খাবেন। দিল্লিওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাক-ওলা-গোশ্‌ৎ' - অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফ্রাই, রোগন যুষ, শাহী কুর্মা, এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না, গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চই সুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ,

মাংস, আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সূপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসীরা বাইশ রকমের সূপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ্ কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ-পেক্!!

বাংলার গুণ না জর্মন গুণী

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু-পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোরু-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বড়-একটা হয় না, করিডরে ত রীতিমত উজোন-ভাটা দুটো স্রোতের মত ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি-রেস্তরাঁর দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুথালু কেশ, লজ্‌ঝড় বেশ। কোন্ খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে—রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে তারও খেয়াল নাই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়া আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি-বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু 'পারদোঁ, পারদোঁ' (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিশন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাঘা কৌটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলেদুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তারই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য-শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টেরে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিক ফিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক ল্যুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতা আর্য, অনার্য, না প্রাক-আর্য, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, 'মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে-সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে ল্যুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না—

'করাচী বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আব ক্যাঁক কবে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন্ ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।

'আর ল্যুডার্স যদি বলেন, "না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোন-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই," তাহলে নাককান বুজে সেই রায় মেনে নিয়ে তাবৎ ঝগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।'

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যুডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ-শিখর-বিশেষ। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুষে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে?

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাদৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশী। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলাভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে-ভাষা পড়াবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু বাংলার মত অর্বাচীন ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা যে সুদূর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ-সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর্ হয়ে গেল, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর নানা অভিধান, ব্যাকরণ। এক পাশে বোটলিঙ্ক-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিগ্‌দর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করুন।'

এতদিন পর আজ আর ঠিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের 'আঁধারে আলো'। 'হাবুবাবু ছোরা চালাতে শিখেছে' এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু 'হাবুবাবু' যোগরূঢ়ার্থে যে শান্ত-শিষ্ট গোবেচারী—নিনকমপুপ—সে কথাটার সন্ধান ভাগনার কোথাও পান নি, অবশ্য আভাসে-আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগনার দেখলুম তাঁর ওয়াটার্লুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতে :—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা

জীবনযৌবন সফল করি মানমু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা—"

আজু-কাজু, পেখনু-টেখমু খাঁটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার ভাগনার কেঁদে-ককিয়ে এসব কথার মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু 'নিরানন্দা' কথায় এসে যে-মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় 'নিরানন্দা'ই থেকে যায়।

ভাগনার বললেন, 'তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় 'দশদিশ নিরানন্দ' হয়ে গিয়েছে?'

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম, 'বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মত বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে 'নিরানন্দা' নয়, আসলে আছে বোধহয় 'নিরদ্বন্দ্বা'। আমাতে প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে—দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও ত ঋষি প্রার্থনা করেছেন, "সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।"

ভাগনার বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?'

এর কোনও সদুত্তর আমি দিতে পারি নি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার 'নবাল' কী?

সুকুমারী ভাষায় বলি :—

'হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?'

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে 'নিরদ্বন্দ্বা' হয়ে ছাপার ভুল করেই যাচ্ছেন, 'ভাগনারেরই লাগছে ব্যাথা, বুঝছে না কি তারা??'

—o—o—o —o—o—o—o --o-- o--o—o —o – o —o—o—

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে :-

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া।
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ

বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশী না ; বাদবাকী আর সবই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী ! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের হাতে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায় ?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের

দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন, মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরনের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা জোগাবে কোন গৌরী সেন? সরকার ও দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলে-মেয়েদের হাতে দেওয়া বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি — তারা এ-সমস্যার সমাধান নানা প্রকারে করে, কিন্তু কোনও ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল ডিরেকশন্' দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়ান' বলতে চান নি—তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত— তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দু ভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে বি. এ. অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসরসময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিত্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর শত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছে হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে

আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই —আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠি ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামী ত প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন ?

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রায় কোনও প্রকারের ফেরফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টি-পরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াতে-নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মীটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্ট-প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেনুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত-সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ-সব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যেসব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সেসব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন—পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু ত বটেই ; এসব পার্টিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোন-না-কোন পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিড়িঙ্গে লাউডস্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ-রকম একটা অভিনন্দন-পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে তুজনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনি নি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারব না।

তুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ-লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখছেন ঃ—

'আমি এ স্থলে —নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী —মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে তুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, তুইজনে নদিয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে তুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া তুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তার যেরূপ মরজি হয়।'

নিত্যি নিত্যি কারণে-অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালীর উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এ-সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে "স্টাডি সার্কাল" বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার বয়স হয়েছে, তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে-অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান— সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করি নে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারি নি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন, এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানে'র অন্ত নেই।

এঁদের একজন ত সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজ-

পুত্রের আদব পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যাবসা ধরতুম।

কিন্তু আমাব দুঃখ ভদ্রলোকটি বড্ডই বাংলা এবং বাঙালী-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদেব শিষ্য-উপশিষ্যেবা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তাঁর মতে যামিনী বায়, যামিনী বায়, এবং আবাব যামিনী বায়। বাংলা দেশের আব সব মাল বববাদ, বদ্দী।

ইনি যেসব 'আর্ট সমালোচনা' প্রকাশ কবেন, তাব সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁবা এসব জিনিসেব সত্য সমঝদাব, তাঁদেব উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশেব সুসন্তানদেব কীর্তি বার বাব স্বীকাব কবা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়াব' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশেব মহাজনকে অস্বীকাব কবা বা খেলো কবে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে – বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পাবি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীব পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে। ভাবতচন্দ্রে পদ্যময় পোলেমিক, আব বাঙলা গদ্য ত আবম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। বামমোহন ত কলমেব লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়েব গোঁড়াদেব সঙ্গে। তাব পবেব বাঘ বিদ্যাসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে-লেখা লিখতে পাবলে পৃথিবীব সবচেয়ে বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে কববেন---অধমেব মতে পোলেমিকে বিদ্যাসাগব মশাই মিলটনেব বাড়া। আব মসীযুদ্ধে বাঙ্গ কী করে প্রয়োগ কবতে হয় তাব উদাহবণ ত আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাবপর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মেব হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে ত অতুলনীয়। ববঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণচবিত্র'এব চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ-মসীযুদ্ধে এবং এ-সত্যও আজ স্বীকার কবব যে, আজ যদি

কোন হেস্তি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না— সে-সাহিত্যিক যে নেই সে-কথা ইস্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাংলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ ; তিনিও ত কম লড়েন নি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম ; কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না !

গল্প শুনেছি উর্দুর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওক্‌কে তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে-কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে-কোন লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু-কথা শুনিয়ে দেয় না কেন ??

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ-বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী। রসনির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ-প্রশ্নও ওঠে, যে-সব লোক এ-আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ-বাবদে কতখানি।

আমার অভি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালীচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না'। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভাল চুল বাঁধতে জানে', কিংবা 'ব্যাবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেও প্রায়

চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছু-দিনের মধ্যেই আপনি স্পষ্ট কতকগুলো জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লি অঞ্চলে আপন ব্যাবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না, সেখান থেকে লোপ পেয়েছে--এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিবমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে- -কিন্তু কখনও হাত পাতে নি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী-সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে তত-খানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে ? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ-প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ-স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যাবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে-চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে

হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এইসব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী! পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রীকাতর অবাঙালীও সে-ঐকতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়ত বলেন 'ভালই হয়েছে।' তা সে-কথা থাক্।

কেন পায় নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কে কেন পারলে না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(১) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে-কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল থিয়েটার চালান চাটুয্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকিলের তাঁবুতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও কর্তা কর্তা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করবে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকার' জন্য?

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর আসামীদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর 'শ্যাম' এবং স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। শুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে-রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সে-রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? কেন হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা— তাই তার ডিসিপ্লিনও ভাল।

এ-আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে বা মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভাল নয়।' কিন্তু এ-কথা ওদিকে বলতে শুনি নি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে ত আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন বস্তু —স্পর্শকাতরতা, না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দেয়ালি

—০—০ ০ —০—০—০—০ —০ —০ —০— ০ —০ —০ —০—০ —০ —

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওই দিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তর আলো জ্বালানো হয়েছিল— বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এই রকম রঙ-বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

আমার কিন্তু এখনও ভাল লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে — যেখানে বিজলী বাতি নেই। বিজলীর প্রধান দোষ মানুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পিদিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলীর নিষ্কম্প আলো বড় ফাঁকা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলী বাতি একবার জ্বালিয়েই খালাস, তার জন্য কোন তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না —মনে হয় সিনেমা সাজানোর আলোও জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা-কোম্পানির আদেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয় নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এ-পিদিমে তেল ঢালছে, ও-পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আর-এক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ

করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরেও পিদিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলী বাতির রোশনাই থাকলে পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়। তদুপরি দিল্লির যে-সব জায়গায় পিদিম জ্বালানো হয় সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই,
'অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।'

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর যে-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন –

'কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে, দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।'

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বার বার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আনন্দদীপগুলি অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কবার তারা এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে॥

গানের কথাঃ ভারত ও কাবুল

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলীও গান গায়।

কিন্তু সত্যই কাবলী গান গাইতে আর শুনতে ভালবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশী। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে-সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। কাবুল শহরে যে দু-চারজন কালোয়াত আছেন তারা প্রায় সকলেই উত্তর-ভারতে বাস করে সদগুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলায় খাঁটী হিন্দী গানে তারা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তারা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদী, গজল-গীত শুনে থাকেন।

কাবুলীরা খাস আরবী ইরানী বা তুর্কীস্থানী সঙ্গীত শুনে সুখ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এর পূর্বে কজন সত্যকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সে কথা আমার জানা নেই, তবে দু-চারজন গিয়ে থাকলেও ওঙ্কারনাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কার্যত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যে-রকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত

ওঙ্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহীর শাহ পণ্ডিতজীকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজীর সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল ; কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলীবা লাগড়া জাত ; তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটিই পণ্ডিতজীর আছে—তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাত তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজীর 'নীলাম্বরী'তে গাওয়া 'মিতুযা' রেকর্ডখানা বাজিয়ে বার বার আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন।

তাই ওঙ্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী।

কিন্তু এই কি শেষ ?

হাউই জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে-লোক তার মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওঙ্কারনাথ কাবুলে যে আতশবাজি দেখিয়ে দিলেন ভারতের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। এরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশী কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনীয়ারি, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিদ্যা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলী 'শাগরেদ' যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব ষোল আনা ; এবং করে পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা—আফগানিস্তান আমাদের তুলনায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, কাবুলে পাশ্চাত্ত্য 'জাজ্‌' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে ; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত, এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অনুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অদ্যকার পরিস্থিতিই বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এ সব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল।

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলী খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিজয় অভিযান উদ্ধার করতে। শক্ত কাজ। দিল্লিতে ত আর কাবুলী সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব॥

উনো, হিন্দী, ক্রিকেট

প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ সুকুমার রায় বলেছেন,

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা ?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অর্থাৎ মানুষ দিয়ে গোঁফের বিচার হয় না —গোঁফ দিয়ে মানুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবী মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্যি নিত্যি তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন, কলকাতা শহর। কী লোকসংখ্যা, কী আয়তন, কী ব্যবসা-বাণিজ্য, কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা —সব দিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে একশবার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লি যে রাজধানী! অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশী।

অর্থাৎ 'রাজধানী'র গোঁফ দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কিনা।

তাই দিল্লির ধারণা ইউ এন ও'র পালা-পরব করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশী এবং এ-সপ্তাহে দিল্লি বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সে-পরব সমাধান করেছেও বটে।

মেলা গুণী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কী গলা, কী বলার ধরন, কী হাত-পা নাড়া, কী উচ্ছ্বাস—সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে

দিতেন, তবে অনায়াসে আমাদের জন্য কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুণীদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাই প্রতীকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেব্রা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই: যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হন নি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়ত বা করলে করতেও পারেন এবং ট, ঠ, ড-ও যে তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইস্কুলের মাস্টার মশায় জমিদারবাবুর ফেল-করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকৎ বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তি-গায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লীতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কাশ্মীর, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিস্, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কাম্-কেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, মীটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লিমেন্টে সদস্যেরা অন্য কোনও অস্ত্র-শস্ত্র পান নি বলে গলার চেন খুলে একে অন্যকে জোরসে ঠুকেছেন—ফলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাংলা দেশের পার্লিমেন্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে মারামারিই ত শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাণ্ডার চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে-চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে-তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক্।

আমাব কাছে আশ্চর্য বোধ হয়, এখনও উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুবোদস্তুব একে অন্যকে অপমান না কবেও তাঁবা কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান কবছেন কী কবে ?

কাষ্ঠবসিকেবা এব উত্তবে কী বলবেন তাও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁবা বলবেন 'আবে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি—বাক্‌যুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকাবেব জীবন-মবণ-সমস্যাব সমাধান হবে না, যেখানকাব কোনও বাগাড়ম্ববই আমাব আপন দেশে কোনও প্রকাবেব প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি কববে না অর্থাৎ আমাব দেশকে এক গিবে জমি কিংবা এক কড়িব আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মাবামাবি হাতাহাতি কবতে যাব কোন দুঃখে ?

হক্ কথা। দুনিয়াব বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালী। আমাব মন বলে কথাটা হক্ হলেও টক কবে মেনে নিতে আমাব বাধে। 'মোহনবাগান'-'ইস্টবেঙ্গলেব'ব খেলাতে কে জেতে কে হাবে, তাতে আমাব কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু তাই নিয়ে তর্ক কবে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেবেছি। সে-বাত্রে না-খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশেব বাড়িব শা বা সাত টাকা সেব ইলিশ কিনে ফিস্টি কবেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব তৎকালিক গুরুত্বব্যঞ্জক (সোজা বাংলায় ইমপর্টেন্ট)।

হিন্দী ভাষা বাষ্ট্রভাষা। তাব জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন, আমাব বুক ফাটবে না। কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দী না শিখলে (এব ইংবেজী বর্জন কবাব পব) আমবা দিল্লিব পার্লিমেন্টে একে অন্যকে বুঝব কী কবে, তাই সবাই হিন্দী শেখ, তখন আমাব মনে আসে উনোব কথা। সেখানে ক গণ্ডা ভাষা নিয়ে কাববাব চলে ঠিক বলতে পাবব না, তবে বিবেচনা কবি ভাবতে যে-কটি ভাষা চালু আছে, তাব চেয়ে অনেক বেশী ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদেব বেশিব ভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মাব সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা

দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-বক্তৃতা ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিশ ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের কানে 'ইয়ার-ফোন' লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে-ভাষায় অনুবাদ চান, সে-ভাষার উপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন। যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ শেষ হয় –সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যে-সব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই তখন 'ইয়ার-ফোন' ব্যবহার করেন না।

তবে দিল্লি পার্লিমেন্টেও বা এ-ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভাগশুদ্ধ লোককেই বা হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে কেন?

হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেন্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দিতেও 'সমসামযিক টীকা' ধাবমান মল্লীনাথ (রানিং কমেন্টারি) দেওয়া হচ্ছে। যেদিন আপিসের অত্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারি নি, সেদিন লাঞ্চের সময় টীকা শুনে জলের আশ ঘোলে নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দী টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানী ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির ইলাহী বজুদিনের মুরব্বী খেলোয়াড়। তাই তিনি বার বার বললেন, 'এর পর আমির ইলাহী সাহেব বড়ী খুবসুরতীকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পকড়লী (ফিল্ড করলেন)। আমির ইলাহীকে 'সাহেব' বলার পূর্বে তিনি অন্য দু-একজনকে 'সাহেব' উপাধি দেন নি। এর পর তার মনে হল সবাইকেই সাহেব বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাফীজকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে লাগলেন।

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেন্দ্র ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজ টীকাকার মিস্টার ব্র্যাডমান কিংবা 'রেসপেকটেড্'

ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌজন্য-ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর যাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহী, কিংবা মুরুব্বী অমরনাথকে 'সাহেব' না বলে বাক্য-স্ফুরণ করি কী প্রকারে ?

টীকাকার আবার হিন্দী-উর্দু দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ-তথ্যও জানেন, করাচি লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কট্টর হিন্দী বুঝতে পারেন না—টীকাকার তাঁদেরই বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

দৃষ্টান্ত দি।

পাকিস্তানের 'অবস্থা তখন বড়ই বিপদসঙ্কুল' হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, 'বিপজ্জনক পরিস্থিতি' ; উর্দুতে বলতে হয়, 'খতরনাক হালৎ'। টীকাকার দু কুল রক্ষা করলেন, 'খতরনাক পরিস্থিতি'। আশা করলেন, পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয়েই বুঝে যাবে 'অবস্থা সঙ্গিন'।

আমি কিন্তু সত্যই স্বীকার করি, ভাষার উপর ভদ্রলোকের দখল আছে। মাঁকড় 'আরামসে সাথ' (অক্লেশে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পঙ্কজবাবু 'আহ্‌সানীসে' (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় 'শানদার' (মহিমাময়) খেল। দেখালেন, নাজির মহম্মদ 'কাইম' ('কায়েমী'— অর্থাৎ সেটেলড্ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন—আরও কত কী !

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসী, কনের পিসী। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন, শাবাশ শাবাশ ! কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি 'অচৈতন্নি', কেউ সিঙ্গল করলে তিনি 'বেহুঁশ'।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি ॥

সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচীর স্তূপের উপর থেকে নীচের দিকে সুড়ঙ্গ কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকা দুটিতে এই দুই মহাস্থবিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাতদৃষ্টিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে-যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে-যুগে বিদেশী শাসনকর্তারা এই ত্রিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল থাকতে পারে সে-কথা আদপেই স্বীকার করতে চাইতেন না—শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরির শাবাশি দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি আমাদের কল্পনাশক্তি—উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা-প্রবণতা। এই 'প্রশস্তি' দিয়ে তার পর-মুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলতেন, 'এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্র মৌদগল্যায়ন, জনপদ-কল্যাণী সবই এদের কল্পনাপ্রসূত—অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।'

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায় দিতেন না বলেই সাঁচীর স্তুপ খুঁড়ে এই দুই শ্রমণের দেহাস্থি বের করা হয়েছিল। পেটিকা দুটি না বেরলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসেব করা কঠিন।

তারপর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক শ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়ে আবার

সাঁচীতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা দুটি বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাস্থি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ্য নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচীতে তার চরম উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন-মাহাত্ম্য কীর্তন করে, একমন হয়ে, তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঈষৎ একটি অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ-দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আড়ম্বর জাঁকজমক আর বাহ্যাড়ম্বরেই শেষ হয় সে-কথা বাংলা দেশের বিচক্ষণ লোকমাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচীর উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে-ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাচীতে সমবেত মনীষিগণ যে একবাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু?

এ-আশা দুরাশা যে-পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ-পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজী, শ্যামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সফল করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কপটাচারী, এ-কথা বলা অন্যায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্মপরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না

করে সে-ধর্মের ফললাভ করবার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না— কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই. আজ হিন্দু খ্রীষ্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী ত সব ধর্মই প্রচার করেছে, তাই এখন প্রশ্ন, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাতবার কী প্রয়োজন।

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর জোর দিয়েছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এর তারই ফলে মৌর্যযুগে ভারত ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়েছিল। সারিপুত্র, মহা-মৌদগল্যায়ন প্রমুখ শ্রমণেরা যদি আপন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বার বার দেখতে পাই, যে কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তাহলে প্রদেশ প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত করে সে রূপ নিত —এবং আদৌ নিত কি না —আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়— আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তারপর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ধর্ষ

আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হল, (কাবুলের গ্রীক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে ই গ্রাকরাই), দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ শ্রমণরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকার বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর আর যে-কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তারপর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল !

এ-দিকে বর্মা, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ভূখণ্ড।

ভারতের মত বিরাট দেশকে চীনের মত বিশালতর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার সুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক্, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারি নে। জানি পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে ত অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভিতর এবং আজও তার শেষ হয় নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না-করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবান্তর), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করেছে এ-কথা ভুল। তথাগতের বাক্য, নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে) ধম্ম, সনাতন হিন্দুধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দু ধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ

ও জওয়াহিরলালের শ্রমণাস্থি স্কন্ধে গ্রহণ কিঞ্চিমাৎ গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেদিন তার বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ফ্রান্সের ব্যুর্নফ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন। ইয়োরোপের জনসাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিলে সে বাণী শুনে! ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশী ধর্মবিমুখ—বিগত দুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে—তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল!

খুদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ-স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেন নি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন নবীন আলোক দিয়ে জাজ্বল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ—বুদ্ধদেব—যাঁর পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে:—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি॥
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি॥।

অ্যার ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারি বা 'জয় রাইড' নয়, রীতিমত দু শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়ত পুষ্পকরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করব তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এত জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়'। সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারেই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধেই' বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাদের এ-যাবৎ হয় নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া।

সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসুন—বাস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু এ-কথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন গতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেন পক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'এ্যার আপিসে'। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না। কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এ-সব এ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এর বেশীর ভাগই ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, ডিঙা মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে. এ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

এ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার তো উর্দি পরে আছেনই, এমন কি টিকিট বাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালীর র‍্যাঙ্ক-ঝিলমিল-বিবরণ—যা খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন কিন্তু সে উর্দি জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দি থেকে স্বতন্ত্র. এ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে ঢুম্ করে একটা স্যালুট করে ফেলে।

তারপর সেই উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজীতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী, তবু ইংরেজী বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন, বি-এ এম-এ পাস করেছেন কিন্তু আমি মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজী বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজী বুঝতে পারি

নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্‌খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে ত ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আর-এক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানিও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। অ্যার কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়েও বেশী।

টিকিট কেটে ত বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহা মূল্যবান 'মূল্য-পত্রিকা'খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত থার্ডো কেলাসে যেতে হলেও ত আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে ত আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট, আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে ত আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়।

আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পাউণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব

"সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল
দুই ভাণ্ড ভাল রাই সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—"

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারিবিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাতিয়া ?

বিছানাটা নিলেন কি ? না। তাব ভেবেছিলেন যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তাহলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোন লাভ হত না, কারণ জিনিসটিকে ওজন ত করা হতই—নালে আপনি ফাকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্রাভেল করবেন—মাত্র চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ফ্রী লগেজ— অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে—সেটার অবস্থা কী হবে মোকামে পৌঁছলে পরে বলব—রওযানা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা বরষাতি অ্যাটাচি হাতে, তার জন্যে ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ !)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধু-বান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওয়ানা দিলেন এবং অ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাতভাই

বাঙালরা যে রকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আফিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে-লোকটা কুলি-চাপরাসীর সমন্বয়—তা হোকগে—কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দী'তে—রাষ্ট্রভাষাতে অর্থাৎ তার অউন, অরি-জিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে-রকম তার বসের ইংরেজী বলার বাই। অথচ উভয়পক্ষই বাঙালী।

আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাংলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলা-ভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলাভাষার' কী কদর, কী সোহাগ।

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মসুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁখ-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের অ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সায়েবী কায়দায়। বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী। সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দিই ত আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী ধোপদুরস্ত ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা, এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরাজীতে যাকে বলে ড্রেয়ারী, ডিসমেল।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে

হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুশতাক আলীর মত ট্রিপলের কাছা-কাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—মুখুজ্যে' যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুজ্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা তুলুন।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে—"

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু অপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে আনা যে-সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম, আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই অপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবীস্তানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে-কোন একটা দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য-কলকাতা থেকে দমদম ক মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয় ; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেটবাস, বে-সরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্শাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরী এই ঢাউস বাস— প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী ?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে-যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয় নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার-পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায়-সর্বাঙ্গ-ঢাকা পদানশিনী হজ-যাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুড়োহুড়ি করার কী প্রয়োজন ?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেস্তরাঁয় ঢুকে এক গেলাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলানো হচ্ছে ?

বয় বললে, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে ও জল না খাওয়াই ভাল।

শুনেছি ইয়োরোপের কোন কোন দেশে নরনারী এমন কী কাচ্চা

বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্ত করে তুলবে না, কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই এখন রুটির বদলে কেক খাব। সে-কথা থাক্।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার জৌলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই তুবার দেখেছি। ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারে নি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না, করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। এক দিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্য দিক থেকে আসছে ; এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ডাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানা রকমের গুজব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না--যে-সব বন্ধুরা 'সী-অফ্' করতে এসেছিলেন তাদের অপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্ম-সম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিরা গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত - আরও কত কী!

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়ে নি। খবর দেবেই বা কী ?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানি নে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজী বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেন নি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার অপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে— পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থ-যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল ত অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেনে চড়ছে তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে না কাহে?'

ওই বুঝলেই ত পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা অতিশয় দ্রুত গতিতে তার চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুনার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি কোনও একটি ঘটনা বিশদ-ভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন 'এখন ত তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগ-

বলে উড্ডিয়মান হতে পারেন।' আমায় এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম :—

"পীরহ্‌া নমীপরন্দ্‌,
শাগিরদান উন্‌হারা মীপরানন্দ্‌।"

অর্থাৎ 'পীর (মুরশীদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)।'

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্না-মালাই (শ্রীআন্নামালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন— সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কী রকম অদ্ভূত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ-অভিজ্ঞতা থেকে এ কিছু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হন নি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে,দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে - এ-জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর

হচ্ছিল অ্যারড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু সেই প্লেন যখন শ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরেব থেকে নীচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট ত দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সব-কিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধান-ক্ষেত আব রেল-লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নীচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা-গঙ্গা! অপবাধ নিয়ো না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা ত এই আজ বুঝলুম তোমাব উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপব কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আব তার উপব শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়াবী জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আব পানসি-ডিঙিব ত লেখাজোখা নেই। এতদিন এদেব পাড় থেকে অন্য পবিপ্রেক্ষিতে দেখছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এবা তেমন কিছু ছোট নয়, আব তুমিও তেমন কিছু বিবাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি--' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমাব বুকেব উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমাব বুকেব তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততীকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডেব সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পাব জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ-আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে।

সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবেব—রুদ্রেব—মুখেব দিকে তাকাচ্ছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ

রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য। কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পুষন্, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব—

‘হে পূষন, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।’

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তারই আদেশে পরিপ্রক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরীরা শুধু তাদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ-নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা ত রয়েছেন। স্বয় রবীন্দ্রনাথ তাদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষনের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল, তাই বলেছেন:—

‘ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গী দল
রক্ত-আঁখি।’

অস্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, ‘স্যর, স্যর।’ এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি

লজেঞ্চুস ! লাল, নীল, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্চুস ! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে।'

এদিকে প্রকৃতির রসরঙ্গ, ওদিকে লজেঞ্চুসের রস। আমি মহা-বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট ত ! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ' ইয়েস, অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশীর ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্চুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদেব মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে ? আল্লায় মালুম।

ও মা, তৎক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়াব বাঁক।

প্লেন আবাব গঙ্গা ডিঙল। একে ত আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে—

'ভাগ্যিস ছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
ও-পারে ??'

ভাষা ও জনসংযোগ

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন ‘বাংলা-সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দী ইংরেজী বনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী, তাদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি তারা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোন কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তার উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করতুম—কিন্তু এর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তার ন্যায্য হক পায় এবং সেই হক সপ্রমাণ করার জন্যে কে তার লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের বচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে-সব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, যে সব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সে-সব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি, সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই

মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে ছুটি জোরাল আন্দোলন সৃষ্ট হয়—তাদের নাম খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ সাধন ধ্যানাদি করে, কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চেষ্টা করেছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায়,এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহ-যোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এই সব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশী—ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সব সময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে—এমন কী 'খেপিয়ে তুলতে'—চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধ-মাগধী, খ্রীষ্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দঃ) ভাষা আরবী। আরবী সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ-ভাষায় আল্লা তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ = নাজিল) করালেন কেন? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে;

আল্লা বলেছেন :

> "Had we sent as
> A Quaran (in a language)
> Other than Arabic, they would

Have said : why are not
It's verses explained in detail ?
What ! (a book) not in Arabic
And (a Messenger an Arab ?)"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম, তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয় নি কেন? সে কী! বই আরবীতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব?"

আল্লা স্পষ্টভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করলেন সেই ত স্বাভাবিক, অন্য যে-কোন ভাষায় (এবং সে যুগে গ্রীক ছিল পণ্ডিতের ভাষা।) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা ত এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

গণ-আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কথা— আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠি (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃত দেব। সাধুভাষা,—তবে কি মারাঠি চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময় প্রচলিত হিন্দী এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়ি-লোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহতা' নীর—যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন? এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেন নি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর-সকলের চেয়ে বেশী।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল; ওদিকে সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করাতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশী—বৌদ্ধ-জৈনদের হার মানতে হল।

পৃথিবী জুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—পণ্ডিতী ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান ত পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথ্য এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে?

এ-তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মাজনিত) নয়, এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এই সব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার উপর- এ কথা পরি-কল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং এঁরাই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না—যদি নীচের থেকে, জনগণের মধ্যখান থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শুধু যাঁরা অন্তহীনকাল ধরে ইংরেজীর সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিবেগ মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ-বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্য-চ্যুতির কারণ হতুম না॥

ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'কম্পালসরি হিন্দী—ইট্স্ এফেক্ট্ অন্ এডুকেশন' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দী অঞ্চলের আপন ভাষা—যথা বাংলা, মারাঠী, দক্ষিণী ভাষাগুলোর স্থান হিন্দী দখল করে নিয়ে সে-সব অঞ্চলে একে অন্যের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি, তবে এটা কি কাম্য হবে যে, হিন্দী ইংরেজীর জায়গা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীযুত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠা ইত্যাদির স্থান হিন্দী কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজীর স্থলে হিন্দী কাম্য হতে পারে না। শ্রীযুত সরকার তাই ব্যাবসা-বানিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজীই চালু রাখতে চান। বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চান—না হিন্দী, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন কোনও ইঙ্গিতও দেন নি যে, আজ হোক কিংবা এক শ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজীই অজরামররূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজী ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজীর মত আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অন্তকার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অন্তকার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজী ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ইংরেজী চিরকালই এদেশের শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ-ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করি নে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজী বর্জন করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করি নে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী, না ফরাসী? 'অজহর' মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আরবী মাধ্যম হবে, তাতে আর কী সন্দেহ! তাই সে-দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু য়ুরোপী ঢঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ত ফরাসী নয়, ইংরেজীও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই অ্যালো-প্যাথি, য়ুরোপীয় ইঞ্জিনীয়রিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয় বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম কি ফরাসীস্? বা তেহরানে?

এই যে চীনে এত বড় রাজনৈতিক এবং সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম করে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন? পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওৎসে তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ-কথা ত কখনও শুনি নি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজী? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরয় কোন্ ভাষায়?

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,—"Even in the Latin Republics of South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for petty purely local transactions) Portuguese and in some of the States the corrupt Spanish by the people."

লাতিন-আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎজ্ঞান নেই, তাই 'পেটি প্যুরলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী? এমন কথা ত কখনও শুনি নি — বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, জর্মনির ইস্কুলে যারা লাতিন গ্রীক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে-কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন-আমেরিকায় ইংরেজীর চেয়ে স্প্যানিশের মাধ্যমেই ব্যাবসা-বানিজ্য ভাল চলবে এ-তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন-আমেরিকা অনেক দূরের পাল্লা— এবারে ইংলণ্ডের খুব কাছে চলে আসা যাক—ইংরেজী ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশী জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য তবু ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয় নি। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজীতে? এদের ব্যাবসা-বানিজ্যের বেশ এক বড় হিস্যা ইংলণ্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য করে নি। আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রীক, নয় ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোনও দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যাবা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদেব সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জর্মন পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্‌স্ এবং ফবাসী, ইংবেজী, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পাবেন, ইংবেজ পণ্ডিতদের বেশীব ভাগ ফবাসী জর্মন পড়তে পাবেন--বিশেষ কবে যাঁবা অর্থ-নীতিব চর্চা কববেন তাঁদেব মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, শুমপেটাব পড়াব জন্য বাধ্য হয়ে জর্মন শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা কবেছেন আমেবিকাতে বসে জর্মনবাই, কিংবা যাঁবা জর্মন জানতেন।

কিন্তু ইয়োবোপে আব যাবা দ্বিতীয় ভাসা হিসেবে ইংবেজী শেখে, ইস্কুল কলেজ ছাড়াব পব তাবা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা কবে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত ইংবেজমাত্রই অন্তত আট বছব ফবাসী শেখেন--কিন্তু কলেজ ছাডাব বছব পাচেক পবই এঁবা আব ফবাসী বই কেনেন না। আমি এঁদেব বাড়িব কেতাবেব শেল্‌ফ্ মনোযোগ কবে দেখেছি—পাঠ্যাবস্থায যে-সব ফবাসী বই তাঁবা কিনেছিলেন তাব উপব আব কিছু কেনবাব প্রয়োজন বোধ কবেন নি। এঁদেব 'দ্বিতীয় ভাষা' সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেবম কে জেবমেব ঠাট্টা মস্কাবা পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা কবে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী কবা যায় না। গোলামদেব কথা আলাদা। তাবা যখন দেখে অর্থাগমেব একমাত্র পন্থা মুনিবেব ভাষা শেখা, তখন সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে—আমি যে-বকম শিখেছিলুম, ফলে আজ না পাবি উত্তম বাংলা বলতে, না পাবি মধ্যম ইংবেজী লিখতে। কিন্তু আমার ছেলে গোলাম নয়—আমাব আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমাব ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পাবে তাতেই আমি খুশী এবং যদি সেদিন তাব খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংবেজ ফবাসী আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ কবে—আজ যে-বকম মাওৎসে তুঙেব চীনা বই বেরনোমাত্রই ইংবেজ

গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অনুবাদ করে, এখনও যে-রকম ইংরেজ 'শকুন্তলা' নাট্যের অনুবাদ করে—তবে আমি অমর্ত-লোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজী থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, এ-কথা ভাবতেও আমার মন বিরূপ হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে ফরাসী কিংবা জর্মনের মত সমৃদ্ধিশালী করতে পারব না?

ভাষা	ভাষীদের সংখ্যা (হাজার সমষ্টিতে)
বাংলা	৬০০০০
আরবী	২৫০০০
চীন	৪৩০০০০
গ্রীক	৫৫০
জাপানী	৫৫০০
জর্মন	৮০০০
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী উর্দু দুই মিলিয়ে না হলে শুদ্ধ হিন্দীভাষীর সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম)	৯০০০০
ওলন্দাজ	১০০০০
ইংরেজী	১৮০০০০
ফরাসী	৭৫০০০
রুশ	৮৫০০০
তুর্কী	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন, কারণ, যে বর্ষপঞ্জী থেকে এই সংখ্যাগুলি পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয় নি।

নরওয়ে	..	২৯৫২
ডেনমার্ক	.	৩৯৭৩
ফিনল্যাণ্ড	..	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২ ; ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখে, ইঞ্জিনীয়ারি করে আর আমরা ৬০,০০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজীর ধামা-ধরা হয়ে থাকব ?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আমরা কল্পনা করতে পারি নি, ফার্সী যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা রাজকার্য চালাব কী করে ! ইংরেজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ইংরেজীতেও চালানো যায়। আজ আমরা কল্পনা করতে পারছি নে, ইংরেজী ছেড়ে আমরা যাব কোথায় ?

কিন্তু অধমের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব ? সে ত আরও ভয়ঙ্কর। আমার আপন অজানাতে যে-সব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যে-সব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত ; আমার মত অর্বাচীনের যুক্তি-তর্কে, বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাঘা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্ডেনও বলেছেন, 'সব সময় তোমার চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে—না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।' ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত—তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এ-রকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরোপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনের নামও তখন কেউ মুখে আনত না। ওই সব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনী 'ভর করেছে' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসী ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জর্মনি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জর্মন রাজা-রাজড়া, নবাব-সুবেদাররা উত্তম ফরাসী-চর্চা করাটাই জীবনের সবপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসী 'পার্লিয়েরেন' ('স্প্রেখেন' ক্রিয়া খাঁটি জর্মন, তার অর্থ 'কথা বলা' কিন্তু জর্মনরা তখন অনুকরণে এমনি মত্ত যে ফরাসী 'পার্লে' ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ 'স্পীক' করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জর্মন ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গেজিন্‌ডে-স্প্রাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জর্মনকে হেয় জ্ঞান করে ফরাসীতে কবিতা লিখতেন এবং সেই বদ্দী কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভলতেয়ারের নাভিশ্বাস উঠত।

তারপর একদিন ফরাসী নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ল্যাজের মত খসে পড়ল। জর্মনই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তারপর জর্মন এল ইংরেজীর আওতায়। শ্রীযুত যদুনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন,—

"The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war No. 1, had made English a *compulsory* second language in all the secondary schools of his

Empire. Was that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (*Hindusthan Standard*, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজীর প্রভাব খুদ জর্মনরা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত য়োহান ভীসনার 'জর্মন-ভাষা শিক্ষা' ('ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে') নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ-পুস্তিকা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুস্‌ মিনিস্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করেন।

জর্মনের উপর লাতিন, ফরাসী তথা ইংরেজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভীসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অনুবাদের সঙ্গে মূল জর্মন এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অনুবাদে কোনও ভুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস-ওলা শব্দগুলো ইংরেজী পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutsch mit englischen Woertern zu ueberfluten. Die weit verbreitete Kenntnis der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutsche G e n t l e m a n im S m o k i n g oder S w e a t e r wenigstens bis zum Weltkriege den Englaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen. Jede Kneipe bis dahin warein B a r, jedes Dampfschiff ein S t e a m e r, jeder Fahrstuhl ein L i f t (mit einem L i f t b o y) jede Fuellfeder eine

Fountain-pen, jeder Fuenfuhr-Tee ein Five o' clock tea. Deutsche Fabrikanten schrieben auf ihre fuer Deutschland bestimmten Erzeugnisse Koh-i-noor made by L. & C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead. Am ueppigsten wucherte das englische natuerlich auf dem Gebiete des Sports; deutsche Mittelschulen veranstalten Foot-ball-meetings und Lawn-tennis-matches wobei alles englisch war, auch das Zaehlen, nur nicht die Auesprache. Wie leichtfertig der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenn er mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der gemixten Sprache des Deutsch-Amerikaners; immer bissitg (busy), kauft sich dieser eine goldene Watschen (watch) startet for hom (geht nach Hause) und ringt die Bell (laeutet die Glocke) order bellt (laeutet einfach).
—ভীসনাব, ডয়েচশে স্প্রাখলেরে, পৃ ৮৫।

"আর উনবিংশ শতাব্দী বইলেন আমাদেব জর্মন ভাষা ইংবেজী শব্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংবেজীর প্রসার এবং ইংবেজী রীতিনীতি প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জর্মন Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পবে বাঁদরেব মত ইংরেজের অনুকবণ করেছিল- একদা যে-রকম জর্মন Cavalier ফরাসীব অনুকরণ কবেছিল। ক্নাইপেকে বলা হত bar, ডামপফশিফকে বলা হয় steamer, ফারস্টুলকে lift (এবং তার ভিতরে থাকত lift-boy) ফ্যালফেডারকে fountain-pen,

ফ্যনকউবটেকে five O' clock tea. জর্মন কাবখানাওলাবা জর্মনিবই জন্য নির্মিত মালেব উপব লিখতেন, Koh-i-noor made by L & C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing-pencil compressed lead. এই (শব্দেব) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশী পল্লবিত হল sports-এব জমিতে। জর্মন হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এব ব্যবস্থা কবল এবং সেখানে সবই ইংবেজীতে চলত, এমন কী, সংখ্যা গোনা পর্যন্ত—একমাত্র উচ্চাবণটি ছাডা (লেখক ব্যঙ্গ কবে ইঙ্গিত কবেছেন—ওই কর্মটি সবল নয বলেই)। বিদেশীব সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জর্মন কী অবহেলায তাব জাত্যভিমান বর্জন কবে তাব উদাহবণ দেখা যায তাব খিচুডি জর্মন-মার্কিন ভাষাতে, 'বিজিব' (Busy) ঘডি কিনলে সেটা Watschen (Watch) startet for hom (বাডি বওযানা দিল) এবং ringt die Bell (ঘণ্টা বাজায) কিংবা শুধু bellt (এখানে লেখক একটু বসিকতা কবেছেন, শুদ্ধ জর্মনে bellt অর্থ 'ঘেউ ঘেউ কবা')।"

তাবপব লেখক দুঃখ কবেছেন যে, এই কবে কবে জর্মন ভাষা একটা জোব্বাব মত হযে উঠল যাব সর্বাঙ্গে বঙিন তালি এবং সে-তালিব টুকবোগুলোও ন না বঙেব নানা জামা থেকে ছিঁডে নেওযা।

আমি অধ্যাপক ভীসনাবেব সঙ্গে ষোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা, তাবে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে প্রচুব বিদেশী শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহবণটি অতি কষ্টে নকল এব অনুবাদ কবে পেশ কবলুম (ভুল কবলুম, ত্যাদ্দিন বাজাবে জোব ঢোল বাজিযেছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি, এইবাবে অনুবাদেব বেলায ধবা পডব) তাব উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসমযে এই পাগলামি বন্ধ না কবত তবে সে এতদিনে কথামালাব চিত্রিতা গর্দভী হযে যেত।

অর্থাৎ আমবা যদি অনন্তকাল ধবে ইংবেজীবই সেবা কবি, তবে আমাদেব বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মর্কটী হযে যাবেন।

এ-বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদী-জন মাত্রই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি, আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোনও প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যে-সব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখেছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নিচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন, (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার আমার অধিকার নেই—তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন) কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বাদ-বাকী বিদেশী ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করবার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কী চাই ? আমি যে-জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যে-সব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না ?

একটা জিনিসকে আমি বড্ড ডরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয় নি। যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের থোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল—তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই, আবার বলছি, গণ-জাগরণ, গণ-আন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্যলাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না—রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে-শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অন্য সর্ব-স্বাধীনতা। এক কথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'চাষাভুষো'কে 'খ্যাপাবার' দরকার ছিল, এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা ফিরে যাক ক্ষেত-খামারে, ফলাক ধানচাল, আর মধ্যবিত্তশ্রেণী, আমরা শহরে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব! তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজিতে করব, বাংলায় করব, না বান্টু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক্। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রী-রী করে ওঠে

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু তোলপাড় করে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ

নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠকসম্প্রদায়কে কখনও কোনও তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অনুরোধ করি নি—তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি—কিন্তু আজ যুক্তি-তর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভিতর বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন - আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন, জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে?

বিদেশী প্রবাদ; সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পার, কিছু লোককে সবদিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পারবে না। আমাদের অধঃপতনের যুগে আমাদের সব লোককে --অর্থাৎ জনগণকে--আমরা অন্ধানুকরণ করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে-কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্রনির্মাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে? আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করি, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা সুধর্ম তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে?

চট্ করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কী তারা সব কিছু বুঝতে পারবে?

এর সদুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইয়োরোপ যেতে হবে।

ফ্রান্স, জর্মনি, হলাণ্ডে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর-কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক,

মাতৃভাষাটি অতি উত্তমরূপে শেখে। তারপর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ধার ভিতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেই দর্শনের—ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু সুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা শুদ্ধমাত্র ম্যাট্রিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

এ ত হল সৃষ্টিকর্ম—এ অনেক কঠিন কাজ—এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোঝা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ-জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যে-কোনও দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভিতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যারা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালী অনেক সময় ওরই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজী-জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞান-লোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিল্টন বলেছেন :—

'ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে উর্ধ্বমুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাদ্য!'

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এদের বঞ্চিত রেখেছেন ; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্য কিছু করতে চান না। (আমি

অবশ্য এঁদের দোষ দিই নে—এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী—কিন্তু এঁরা অন্য যুগের লোক, ইংরেজী লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সে-কথা আমরা জানি, ক্রীশ্চান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানরা ফার্সী এবং ইংরেজ ইংরাজীকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। ফলে মুসলমান যুগে যাঁরা ফার্সী জানতেন তাঁরা ছিলেন 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র' আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত 'ক্রীশ্চান যুগে' কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি 'হিন্দু পিরিয়ড' এবং 'মুস্‌লিম পিরিয়ড' হয়' তবে তৃতীয় যুগ 'ক্রীশ্চান পিরিয়ড' হবে না কেন ?—এ-তত্ত্বটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিষ্মান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যাঁরা ইংরেজী জানতেন, তাঁরা ছিলেন 'ভডরোলোগ্ ক্লাস, অর্থাৎ 'শরীফ', অর্থাৎ 'ভদ্র'।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র' বলতে আমরা আবহমান কাল এমন কিছু বুঝেছি যার সঙ্গে ফার্সী কিংবা ইংরেজী জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান যুগে বরঞ্চ ভদ্রে গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা ; কিন্তু ক্রীশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজীজ্ঞ এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরাট, নিরেট পাঁচিল তুলে দিলে যে, আজও আমরা সে-দেয়াল ভাঙতে পারি নি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাই নে। আমরা এখন ইংরেজী-জাননে-ওলা আর ইংরেজী না-জাননে-ওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ-ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সে-কথা আরেক দিন হবে॥

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায় ?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং সেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান জয় করার পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগাগোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানী দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানী শব্দ 'শাহ' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু 'শাহ্' বলত।

এর পর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ্' বলত। সেই 'শাহ্' লাতিনের ভিতর দিয়ে ইংরেজীতে রূপ নেয় 'শেক্' এবং সবশেষে 'চেক্' রূপে (ব্রিটিশ 'এক্স্‌চেকারের নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওই ভাবেই আরবী, 'শাহ্, মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজীতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানীরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে ? দাবা ইরানী খেলা এ-দাবি পারস্য দেশে কখনও করা হয় নি। বরঞ্চ সে-দেশে কিংবদন্তী প্রচলিত যে, এ-খেলা 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের মত ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর পণ্ডিত অল-বীরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক এঁকে দিয়েছেন ও ঘুঁটিরও বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে-দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হ'ত চারজনে—ছকের চার কোণে চার খেলোয়াড় আপন আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অক্ষ) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতী দাবা হুবহু এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লিমেণ্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই : –

হেলসিন্‌কিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায় নি! অবশেষে নাকি এক ফিন যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে!

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে,তিনিও এই রকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অন্যান্য জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজন্য-শালীনতা বিদেশী বহু পর্যটককে মুগ্ধ করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ-ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, এ-কথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায় নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খাতির যত্ন পায়।

তবে হঠাৎ আজ এ-রকম একটা পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটল কেন?

আমার মনে হয়,আমাদের টীমের কর্তাব্যক্তিরা পরবটার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে

যাচাই করতে পারেন নি বলে সবাই মিলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুর্তিফার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তাতে আর কী সন্দেহ !

কর্তারা শহরে বেড়াতে যান নি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ-টীমে যারা গিয়েছিল তাদের দু-একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্য তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবশ্যই, শহরে চলে যেত না—সেখানে শেষ পর্বের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করবার জন্য নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয় ?

কাজেই মুরুব্বীদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তারা তখন ছিলেন কোথায়, তারা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না ?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেণ্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেইদিনই শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত জিওলজিকাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায় অভদ্র ভাষায় লেখা বেনামা চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুর্তি-ফার্তি, আরাম-আয়েশ বসে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ণিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ-ধারণা ভুল এবং এ-অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে ছাদিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলা-ঢলির ('ঈজী লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা—বিদেশে নানা শ্রেণীর খেলোয়াড়দের সংশ্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভূরি

ভূরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ-সংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কি না, যাতে করে পরের দিন তারা ভাল করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে কদিন খেলা হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন সব হোমরা-চোমরাদের নেমন্তন্ন করে যে, সেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তারপর নানা কায়দায়-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা পালা-পরবে নিতান্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং ক্যাপ্টেন অবশ্য মুর্গীর মত চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেরে ওঠেন না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে-সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। ফার্সীতে বলে 'দানিশমন্দরা ইশারা বশ অস্ত'— অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

ফলং ? পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিতান্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়ত অমূলক, হয়ত আমি খামখাই ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছি, হয়ত আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকীবহাল হওয়ার জন্য বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই
(যদিও জানি
'মারেরও সাবধান নেই')।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জাম সাহেব, ব্রাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমর সিং, মুশতাক, ওয়াজির আলী এবং একমাত্র এঁদের মত পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাঞ্চল্যটা কী রকমের হয়?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও প্রেসিডেন্টস্ এস্টেট ক্লাবে যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও 'অনিবার্য' কারণে এঁদের কোনও মহারথীই উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দিল্লির রীতিমত পুরাদস্তুর কেউ-কেটা কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও ত আমাদের শ্লাঘার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ-খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছি নে?

কিন্তু হায়, আমার দারুণ দুর্ভাগ্য, এ-খেলার মল্লিনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ ও-খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নি যদিও, আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধাবেন, কেন উপস্থিত হতে পার নি?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র এত বড় সম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদ্যতা, তাঁরা আমার মত একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পরবের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন? কেন, আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি নেবু দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করি নি? অবশ্য স্বীকার করি উইকেট্ ছিল না—কিন্তু উইকেট ত থাকে ক্লান্ত হলে বসবার জন্য, আমি ত ক্লান্ত হই নে।

ম্যাচ ড্র গেছে। যাবে না? আমাকে না নিলে!!

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন এবং স্কট নাকি বারোয়ারী চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসী এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকিনিকিয়ারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী-শালাদের, তারা আনে তাদের কাকা-মামাদের এবং তারা ফের কাদের নিয়ে আসে তার হদিস এখনও পাই নি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফটবল, গ্রামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মন তিনেক পুরি, তদনুপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাপ্পা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেনস্। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী পীড়াদায়ক হয় এই সব পাইকিরী পিকনিকে। বে-খেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন ছুম্ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ করুন, আমার তাতে কি আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মরুভূমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে ঘাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মত শান্ত লোকও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আগুন জ্বালানো বারণ, তাঁরা জ্বালাবেনই এবং চৌকিদার

আপত্তি জানালে তাঁরা ঝগড়া-কাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোন আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রৌপ্যচক্র অস্বচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে দেখবেই বা কী করে!

তাই দিল্লিতে আগমনেচ্ছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেয়ো না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেয়ো সরযূকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে॥

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর 'অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী' লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারো কারো মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার সুযোগ—কিংবা কুযোগ—আমার এখনও হয় নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী, সে কথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবন বিখ্যাত পুস্তক থেকে দুটি-একটি অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। তা। সে কী ইংরেজীর বাহার—তার ভিতর কত ভাষা থেকে, কত বিভিন্ন থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত বাকচাতুরী—ছত্রে ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে—মূল বিষয়ের দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি।

তা সে বইয়ের কথা যাক। ও-রকম বই পড়ার বয়স আমার বর্তমানে চলে গেছে। এ ধরনের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলছিলেন, 'আমার সে বয়স গেছে, যখন মানুষ যা বোঝে না তাই ভালবাসে। আমি আলো ভালবাসি।' নীরদ চৌধুরী যে-রকম এ-যুগের ভলতেয়ার, আমো এ যুগের ফ্রাঁস॥

শ্রীযুক্ত চৌধুরী পত্রান্তরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী খাঁটি মানুষ ; তাঁরও নানা দোষ আছে। কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনম্রভাবে অবনত এ কথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না।

ইংরেজী লেখক হিসেবে মিঃ চাওডরি কতখানি নাম করেছেন জানি নে—জানার প্রয়োজনও বোধ করি নে। বিবেচনা করি অ্যাদ্দিনে তিনি ল্যাম, বাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি 'হেলায় লঙ্কা করিত জয়' শুনে আমার মনোবাজ্যে নানাপ্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের সৃজন হয়েছে।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জন্য এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত্। তিনি কাঁচা বা নিকৃষ্ট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কীট্‌সের মত কোন ভয়ঙ্কর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেন নি, সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

তবে এ দম্ভ কেন? এর সোজা অর্থ কি এই নয়, ওহে বাঙালী গ—ভ—গণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। নাম করতে হয় ত ইংরেজীই সই।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য।

বৃথা তর্ক। আমি শুধু শেষ প্রশ্ন শুধাই- স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকে তাচ্ছিল্য করে কে করে সত্য বড় হয়েছে??

আসা-যাওয়া

পুব ও পশ্চিম দেশবাসীদেব ভিতব মেলা মিল আব গবমিল দুইই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিলন অসম্ভব, আব তাব বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন 'পুব পশ্চিম এখন আব আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পাববে না।'

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, ববি ঠাকুব, লিন্ য়ুটাং একমত হতে পাবছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন্ সাহসে ? যেখানে ফৈয়াজখানে আব হীরু গাঙ্গুলীতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমক্কা বে-সমে হাততালি দিয়ে মবি আব কী ?

তব্ সামান্য একটা কথা নিবেদন কবতে চাই।

পশ্চিমেব লোক কখনও কাবও সঙ্গে কথা ঠিক না কবে, অর্থাৎ পাকাপাকি এনগেজমেণ্ট না কবে দেখা কবতে আসে না। এবং টম যদি ডিকেব বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকেব অনুমতি না নিয়ে কখনও আসবে না। কিন্তু, পশ্য, টম ডিকেব অনুমতি নিয়ে এল বটে —ক'টাব সময় ভেট হবে—কিন্তু সে যখন খুশি চেয়াব ছেড়ে বলতে পাবে, 'তবে এখন চললুম'—তাব জন্য ডিকেব কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োবোপে কাবও বাড়িতে যাওয়াটা তাব হাতে, বেবিয়ে আসাটা আপনাব হাতে।

প্রাচ্যেব প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উল্টো। আপনি যখন খুশি বায় মহাশয়েব বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পাবেন। 'এই যে বায় সাহেব' বলে হুঙ্কাব দিয়ে আপনি বায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর বায়ও 'এই যে চৌধুবী মশায়,আসতে আজ্ঞে হোক,বসতে আজ্ঞা

হোক’ বলে কোল-বালিশ আর হুঁকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশটা জাবড়ে ধরে ফুরুৎ ফুরুৎ করে আলবোলায় দম টামতে টানতে মৃত্থু মৃত্থু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বলবেন ‘এবারে উঠি ?’ তখন কিন্তু রায়েব পালা। আপনি যে হুম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন ‘আরে, বসুন, স্যার। এত তাড়া কিসের।’ আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সখ্‌ৎ বে-আদবী।

এর গুহ্য কারণ, হয়ত আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়ত কাশী-বাস সেরে ফিরেছেন, রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জন্য সিঙাড়া ভাজবার তোড়জোড় করেছেন. আপনি হট্‌ করে চলে এলে তিনি মনক্ষুণ্ণ হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অনুমতি নিতে হয়।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ভেগেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে। মাহমুদকে নিয়ে ফিরদৌসীব ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ দেশ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যিখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদেব মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মত পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন ‘ন্যাশনাল ব্লাউস’ জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মত সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না-দিয়ে, দুইই। বিদেয় নেবাব সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করে। গাল-গল্পের মাঝে একটুখানি মোকা পেলে বলে, ‘এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পাপিরসি খেয়ে বাড়ি যাব।’

এ বড় উত্তম পন্থা। আন্তোন যদি ভ্যাচোর-ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদ্দণ্ডেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, ‘যাক, লক্ষ্মীছাড়াটা তাহলে আর

বেশী ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খুশী মুখে দু-চারটি কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আন্তোন যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে তার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্য আপনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়া মাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়, পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উলটো—পাঁচটি টাকা ধার চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা-আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk এবং শিবরাম চক্রবর্তীর অনুpunএ 'টক বিজিনেস।।'

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখো রওয়ানা দেন। এমন কী সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফী-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েণ্ট-লূসস্ক্রু-আণ্ডার-ভস্ম-আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের-কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই-পারুক, তাকে অন্তত পক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনারা প্রায় আপ্ত-বাক্যরূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপন জন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা

প্রধান বক্তা কোন আণ্ডার সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ-মুহূর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, যখন সেক্রেটারি-দের মস্করা করে কবিতা পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটুট নয়) খুলেছি, কিছু না পেরে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্যম্ নাচি নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হনুমানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নর্বসি দাস' প্রাইজের বদলে সেই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংশ্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার নামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কস্মিনকালেও নামত

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখামাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে' বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, 'ওইরে, আবার এসেছে' বলে দুদ্দার করে দরজা জানলা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান' করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক, আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তাহলে তবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দেখি দিল্লি খারাপ জায়গা নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মল্লের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতিক্ষায় প্রহর গোনেন, আপনার ত্রিযামা-যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গসুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার ওস্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চুড়ো, রাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সর্বশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটি পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রন্ধ্র ভরে নেন, ইতিমধ্যে শুনতে পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসী-দাসকৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যের পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন···

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন? সকালবেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে,

এইবার ছাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিক্কণ আলিম্পন, আপনার আমার মত গরিবের খালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে —আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দদিন স্বর্ণরৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয়।